সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ● জুলাই-আগস্ট ২০১৫ ● পাঁচ টাকা

মধ্য আয়ের বাংলাদেশ

লুটেরাদের উল্লাস আম জনতার গলায় ফাঁস

নতুন অর্থবছরের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে আমরা জানতে পেলাম, বাংলাদেশ এখন মধ্য আয়ের দেশ। এ খবরটি আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশটি যে 'মধ্য আয়ের' দেশে পরিণত হয়েছে সেটা দেশের বেশিরভাগ মানুষ টেরই পেল না। শুধু এক ময়মনসিংহ শহরে যাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে শিশু-নারীসহ ২৭ জন মানুষ পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করল। আর এর আগে বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে পাচার হয়ে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের করুণ পরিণতির খবরও তো আমাদের স্মৃতিতে এখনো তাজা। তারপরও বাংলাদেশ আর গরিব দেশ নেই!

অবশ্য প্রতিদিন চোখের সামনে অল্প কিছু মানুষের বিলাস-ব্যসন আর চাকচিক্য, হিমালয় সমান বিত্ত-বৈভব দেখে গরিব মানুষদের মনেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়, এ দেশটা আর গরিব মানুষের দেশ নেই। নিজেদের পেটে ভাত, পরনের কাপড় না থাক, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-চিকিৎসা না থাক, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাক, চারদিকেই তো শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন! সবেধন নীলমণি বিটিভি'র পরিবর্তে এখন ২৪-২৫টি নানা নামের টেলিভিশন চ্যানেল, ঢাকা শহরের এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠা শত শত হাইরাইজ ভবন, বিরাট বিরাট শপিং মল, রাস্তায় কোটি কোটি টাকা দামের বিলাসবহুল গাড়ি – এমনি আরো কত কি! মধ্য আয়ের কেন, এ দেশটাকে তো বড়লোকের দেশই বলা উচিত!

(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মোদিরা এদেশে কল্যাণের জন্য আসে না

অনির্বাচিত, অবৈধ, অগণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে পরিচালিত এই দেশে মানুষ প্রতিদিনই একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম থেকে শুরু করে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস - একের পর এক ঘটনায় মানুষ দিশেহারা। কেউ জানেনা আজ কেমন যাবে। কখন যে কোন ভয়ংকর খবর আসবে, তা ভেবেই মানুষ নিয়ত আতঙ্কগ্রস্থ। তবে খুব সম্ভবত এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর। ভারত এশিয়ার অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে আশেপাশের দেশগুলোকে তার প্রভাববলয়ে রাখতে চায়। শুধু বাংলাদেশ নয়; নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের উপর সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। তাই পাকিস্তান ব্যতীত ভারতের পাশে অবস্থিত সকল দেশের উপরই ভারতের প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা আছে। আমাদের দেশেও আছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় বসা ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বজন স্বীকৃত। আবার অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ), ভারতের আশেপাশের দেশগুলোকে ভারতের প্রভাবান্বিত এটা ধরে নিয়েই তার ভিত্তিতে এই দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। তারা নিজেরা যে কিছু প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেনা তা নয়, তবে তার কোনো কিছুই ভারতকে ছাপিয়ে নয়। তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এদেশে আগমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই বটে।

মোদির আগমণের প্রতিবাদে ৮ জুন ঢাকায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বিক্ষোভ

নরেন্দ্র মোদি এদেশে যখন আসবেন তখন বাংলাদেশ-ভারতের বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে কথা বলবেন এবং তার সমাধানের রাস্তা নির্দেশ করবেন – এমন কথাই শোনা যাচ্ছিল। বিশেষ করে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন, সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেবেন ও প্রয়োজনীয় চুক্তি তিনি করে যাবেন – এমনটাই অনেকে ভেবেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের আশার গুড়ে বালি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। অথচ ভারত কানেকটিভিটি, ২৩টি পণ্যের শুল্ক ছাড়, বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ করিডোরসহ যা যা চেয়েছে তার সবগুলোর ব্যাপারেই সুস্পষ্ট চুক্তি করে গেছে। শুধু ছিটমহল বিনিময়কে আমাদের প্রাপ্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ সেটা ৪১ বছর আগেই আমাদের পাওনা ছিল, ভারত এবার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে মাত্র।

সুতরাং ফল কিছুই এদিকে গড়ায়নি। উপরন্তু বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করা এই দেশের উপর দিয়ে নরেন্দ্র মোদির মতো মানুষ ছড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলেন। কেউ কোনো কথাই বলতে পারলো না। নরেন্দ্র মোদি কে – পাঠকরা তা ভালোভাবেই জানেন। গুজরাট হত্যাকাণ্ডের এই খলনায়ক এদেশ সফর করে আমাদের ন্যায্য পাওনার ব্যাপারে কোনো আলাপ না করে, ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে সবরকম চুক্তি করে বিপুল সম্মান ও সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে ফিরে গেলেন।

এটি আমাদের জন্য লজ্জার। বুর্জোয়া সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষত আওয়ামী লীগের বাইরে বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি মোদিকে স্বাগত জানিয়েছে। সরকারের বাইরে থাকা বামপন্থী দল, যাদের পরিচিতি ও সংগঠন আমাদের চেয়েও বেশি – তারাও মোদিকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনচেতা মনোভাব এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে দারুণভাবে আহত হয়েছে। কোনো কিছু আদায় না করে সবকিছু দেয়ার যে কষ্ট, যে অবমাননাবোধ – সেটাকে ধারণ করে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার মতো কোনো সংগঠিত শক্তি এ সময় ছিলনা। আমরা গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন বাম মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশুকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়, বাসদ (মার্কসবাদী)-সহ *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাজেট : গরিব মানুষের ওপর লুটপাটের মাত্রা আরও বাড়াবে

জুলাই মাসের প্রথম দিন, নতুন অর্থবছর শুরু হচ্ছে, নতুন বাজেট কার্যকর হচ্ছে। ঠিক সে সময় জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া আমাদের সামনে এক অভিনব তথ্য হাজির করলেন। তিনি বলেছেন, কার্যকরভাবে বাজেট প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাদের কথার মাধ্যমে বাজেটের একটি হরফও পরিবর্তন হয় না। তাঁর মতে, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণই আমলাতান্ত্রিক। আসলে ডেপুটি স্পিকার একটি পুরনো সত্যই নতুন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অগণতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণয়ন বহু দিন ধরেই হচ্ছে। তার ওপর এখন তো দেশে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক কায়দায় একটি অনির্বাচিত সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতাসীন। এই অনির্বাচিত সংসদে পুরনো প্রক্রিয়াই পুনরাবৃত্তি হয়েছে মাত্র।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসের ৪ তারিখ জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৫-'১৬ অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত সেই বাজেটের ওপর সংসদে ২০০ জনেরও বেশি সংসদ সদস্য প্রায় ৬০ ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন। সংসদের এই বাজেট অধিবেশন পরিচালনা করতে ব্যয় হয় শত কোটি টাকা। এবং এই অর্থ ও সময়ের ব্যয় যে কতটা অর্থহীন তা তো আগেই বলা হয়েছে।

বাজেট শুধু আমলাতান্ত্রিকই নয়, অগণতান্ত্রিকও

এক দীর্ঘ ব্যয়বহুল অথচ অর্থহীন প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জুন সংসদে পাস হল ২০১৫-'১৬ অর্থবছরের বাজেট। এদেশে বাজেট শুধু আমলাতান্ত্রিকই হয় না, অগণতান্ত্রিকও হয়। অগণতান্ত্রিক বলতে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সবদিক থেকেই অগণতান্ত্রিক। বাজেটের উদ্দেশ্য কি থাকে? বাজেটের উদ্দেশ্য থাকে দেশের শিল্পপতি-ব্যবসায়ী লুটপাটকারী চক্রের মুনাফা ও লুটপাটের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

এবারের বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দ (শতাংশ) হল – সুদ পরিশোধ ১৮.৪, জনপ্রশাসন ১৫.৭, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ১০.৯, প্রতিরক্ষা ৮.৫, ভর্তুকি ও প্রণোদনা ৯.৯, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ৬.১, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা ৫.৯, পেনশন ৫.০, স্বাস্থ্য ৩.৬, পরিবহন ও যোগাযোগ ২.৬, কৃষি ২.৪, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ১.৫, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম ০.৭, গৃহায়ণ ০.৫, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস ০.৩ এবং বিবিধ ব্যয় ৮.০। এবারের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক ঋণের সুদ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মেটাতে খরচ হবে। এবার রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ এক লাখ ৯৬ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, রাজস্ব বাজেটের সবচেয়ে বেশি অর্থ ৫৬ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা চলে যাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতায়, যা মোট রাজস্ব বাজেটের ২৯ শতাংশ। আর সুদ পরিশোধে খরচ হবে ৩৫ হাজার ১০৯ কোটি টাকা বা ১৮ শতাংশ। অর্থাৎ মোট রাজস্ব বাজেটের ৯১ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা বা ৪৭ দশমিক ৭৩ শতাংশই খরচ হবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং সুদ মেটাতে। মোট বাজেটের ৩৪ দশমিক ১ শতাংশই চলে যাবে এ দুই *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মোদিরা এদেশে কল্যাণের জন্য আসে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বামমোর্চার শরীক দলগুলোর অফিস শত শত পুলিশ ঘেরাও করে রাখে। অফিসের নিচ থেকে গ্রেফতার করা হয় বাসদ (মার্কসবাদী)-র কর্মী শরীফুল চৌধুরী, প্রগতি বর্মন তমা এবং সায়েমা আফরোজকে। প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ৩ জন এবং নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার ২ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

কি পেল বাংলাদেশ

নরেন্দ্র মোদির সাথে যৌথভাবে '৬৫ দফা ঢাকা ঘোষণা' এসেছে। এটি পুরোটাই একটি আত্মসমর্পণের দলিল। ভারতের একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের স্বার্থে 'কানেকটিভিটি' দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে বিনা শুল্কে ভারতের ২৩টি পণ্যের বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ। ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ থাকছে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলোর জন্য। শুধু তাই নয়, মংলা ও ভেড়ামারায় প্রতিষ্ঠিত হবে ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। খুলনা ও মংলার মধ্যে রেল সংযোগ চালু হচ্ছে। খুলনা ও কলকাতার মধ্যে চালু হচ্ছে দ্বিতীয় মৈত্রী রেল। ফলে মংলা বন্দর ও মংলা ইপিজেড থেকে ভারতীয় পণ্য আনা-নেয়ায় আর কোনো বাঁধা থাকবে না। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের মুজাফফর নগর পর্যন্ত হবে বিদ্যুৎ করিডোর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট নিয়েছেন। মোদি বলেছেন ভারত তার বৃহৎ অংশীদার হতে চায়। তাই আদানি গ্রুপ ও আম্বানিদের রিলায়েন্স গ্রুপের সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশেষ ব্যাপার হলো এটি একটি দায়মুক্তি চুক্তি। এই প্রকল্পের কাজ হবে বিনা টেন্ডারে এবং এর কোনো ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে কোনো কথা তোলা যাবেনা, এদেশের আইনে কোনো বিচারও হবেনা। আদানি ও রিলায়েন্স মিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬০০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে আদানিরা উৎপাদন করবে ১৬০০ মেগাওয়াট আর রিলায়েন্স গ্রুপ করবে ৩০০০ মেগাওয়াট। দু'জনে মিলে বিনিয়োগ করবে প্রায় সাড়ে পাঁচশত কোটি টাকা।

দেশের বিদ্যুৎ খাতের ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের মতো দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে নিজেদের বিদ্যুৎ খাতকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর দরকার ছিল, সেখানে দেশের বিদ্যুৎ খাতকে রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রথমে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। এখন আবার বিদ্যুৎ সেক্টরে ডেকে নিয়ে আসা হলো ভারতীয় পুঁজিকে, তাও আবার দায়মুক্তি দিয়ে। আমাদের মতো ছোট একটা দেশের জন্য এটা কতটুকু দরকার আর এভাবে দেয়া কতটুকু ঝুঁকির তা একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন। কারণ দেশের বিদ্যুৎ খাতকে সম্পূর্ণ সরকারি তত্ত্বাবধানে রেখে চালানোর ক্ষমতা সরকারের আছে। সেটা বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে বারবার হিসেব কষে দেখানো হয়েছে তাদের। রেন্টাল-কুইক রেন্টালের বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়েছে। আজ কোন প্রয়োজন, কতটুকু প্রয়োজন তার কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই আদানি-রিলায়েন্স গোষ্ঠীকে এভাবে ডেকে আনা হলো।

সবমিলিয়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের রমরমা অবস্থা। এদেশ থেকে যতরকম সুবিধা দরকার তার আঠার আনা তুলে নিয়ে তারা দিল্লী ফিরে গেলেন। বাংলাদেশ সরকার শব্দমাত্র খরচ করলেন না, উপরন্তু সারাদেশকে এ ব্যাপারে নিঃশব্দ থাকার ফরমান জারি করলেন। অথচ দেশের মানুষের প্রাণের দাবি তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে মোদি আশাবাদের বাইরে কিছুই বললেন না। সীমান্ত হত্যার কোনো কার্যকর সমাধানও নির্ধারণ করে গেলেন না। আমরাও তাদের কিছুই বললাম না। অথচ ভারতের পক্ষে এতগুলো অর্জন নিয়ে, দেশের সরকার ও সকল ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোর বিপুল সংবর্ধনা ও অভিনন্দন সহযোগে মোদি বীরদর্পে ঢাকা ত্যাগ করলেন।

কিছু প্রাপ্তি এদেশের পুঁজিপতিদেরও ঘটেছে। ভারতের কিছু অঞ্চলে ব্যবসার সুযোগ ঘটেছে। বাংলাদেশ থেকে ভুটানে পণ্য রপ্তানী সহজ হয়েছে। আগে ভুটানে পণ্য রপ্তানীতে যেখানে ২১ দিন লাগত, এখন লাগবে ৬ দিন – ইত্যাদি কিছু সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা পেয়েছেন। এদেশের গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা ওয়্যার হাউজের জন্য জায়গা পাওয়ার অঙ্গীকার পেয়েছেন। কিন্তু তাতে জনগণের কোনো লাভ নেই। বাংলাদেশের না পাওয়ার তালিকাটা আসলে আরো দীর্ঘ। ভারতের অর্থায়নে বাংলাদেশের সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে যে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হতে যাচ্ছে, যা সুন্দরবনের জন্য নানা দিক থেকে বিপদ তৈরি করবে, সে সম্পর্কে মোদির সফরে কোনো আলোচনা হল না। বাংলাদেশ ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার বিষয়ে কোনো আলোচনা হল না।

দেশের অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার দেশের স্বার্থের চেয়েও জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের ভিত্তিতে যে পুঁজির বিস্তার এখানে ঘটেছে, হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক পুঁজিপতিদের যে গোষ্ঠিটির এখানে জন্ম হয়েছে, তাদেরই স্বার্থের প্রয়োজনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতের সাথে অসম চুক্তিগুলি করেছে। দেশের মানুষের মাঝে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি গড়ে উঠতে না পারার কারণে মানুষের মাঝে অবমাননা ও হীনমন্য মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের দেশপ্রেম প্রতিনিয়ত পরাজিত হচ্ছে। দেশের পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও তাদের অনুগত শাসকশ্রেণী যেভাবে চাইছে প্রায় সেভাবেই দেশকে পরিচালিত করতে পারছে একটি সংগঠিত আন্দোলনকারী শক্তির অনুপস্থিতির কারণে।

তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন এখন বাংলাদেশের মানুষের জীবন মরণের সমস্যা

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি। ভারত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি লংঘন করে উজানে নিজেদের অংশে অধিকাংশ নদীতে বাঁধ দিয়েছে এবং একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা – প্রধান এই ৩টি নদীই ভারতের জল-আগ্রাসনের শিকার। ভারত পদ্মার উজানে ফারাক্কায় বাঁধ দিয়েছে। তিস্তা নদীর উজানে সিকিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গে গজলডোবা ব্যারেজে পানি প্রত্যাহারের কারণে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। মেঘনার অন্যতম উৎস নদী সুরমা-কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের আয়োজন চলছে। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে এদেশের মোট পানিপ্রবাহের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে। ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে সেই ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছে। এছাড়াও মনু, খোয়াই, মহানন্দা, গোমতী, মুহুরী, পাগলা, করতোয়া, জিঞ্জিরাম নদীর উজানে ভারত বাঁধ নির্মাণ করেছে। সিলেটের সারি নদীর উজানে মেঘালয়ে বাঁধ দিয়ে ১২৬ মেগাওয়াট মাইনথ্রু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি নদীগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনেকগুলো জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ডিহিং বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর ওপর), সুবানসিঁড়ি বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর ওপর), লোহিত বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর ওপর), যাদুকাটা বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (মেঘনার শাখা নদীর ওপর), সোমেশ্বরী বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (মেঘনার শাখা নদীর ওপর), ভৈরবী বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (বরাক নদীর শাখার ওপর), নোয়া ডিহিং বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখার ওপর), কুলশী বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখার ওপর) ইত্যাদি। প্রত্যেকটি প্রকল্পেই কমবেশি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের ওপর। ফলে বাংলাদেশে মরুকরণ বাড়ছে। কৃষিপ্রধান এই দেশের জন্য নদী এক অমূল্য সম্পদ। গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষ কাঁদছে। কৃষিজমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কৃষক পথে বসছে। তিস্তা রক্ষার দাবিতে শুধু কৃষকই নয়, সমস্ত শিক্ষিত, সচেতন, দেশপ্রেমিক মানুষই পথে নেমেছেন।

... ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের রমরমা অবস্থা। এদেশ থেকে যতরকম সুবিধা দরকার তার আঠার আনা তুলে নিয়ে তারা দিল্লী ফিরে গেলেন। বাংলাদেশ সরকার শব্দমাত্র খরচ করলেন না, উপরন্তু সারাদেশকে এ ব্যাপারে নিঃশব্দ থাকার ফরমান জারি করলেন। অথচ দেশের মানুষের প্রাণের দাবি তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে মোদি আশাবাদের বাইরে কিছুই বললেন না। সীমান্ত হত্যার কোনো কার্যকর সমাধানও নির্ধারণ করে গেলেন না। ... ভারতের পক্ষে এতগুলো অর্জন নিয়ে, দেশের সরকার ও সকল ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোর বিপুল সংবর্ধনা ও অভিনন্দন সহযোগে মোদি বীরদর্পে ঢাকা ত্যাগ করলেন।

কিন্তু এ নিয়ে কোনো চুক্তি হলো না। মোদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো বলে গেলেন, তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। যুক্ত ঘোষণার ১৯ নং আর্টিকেলে বলা হলো, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি অনতিবিলম্বে স্বাক্ষরের অনুরোধ জানালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিস্তা ও ফেনী নদীর পানিবণ্টন চুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা চলছে। দ্রুত পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানিবণ্টন নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ে আলোচনা চলছে – এমনটি উভয় প্রধানমন্ত্রী আমলে নিয়েছেন।'

তাহলে বুঝুন অবস্থাটা। কত ঢিলেঢালা ভাব, কত উপেক্ষা এ বিষয়ে। অথচ এটি বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা। ভারত সব অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের সমন্বিত পরিকল্পনার বদলে একেকটি করে আলোচনা করছে। অভিন্ন নদীর পানি সমন্বিত ও যৌথ ব্যবস্থাপনা-ব্যবহার-উন্নয়ন-রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে যৌথ অববাহিকা কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার। ইউরোপে রাইন নদীর অববাহিকায় যত দেশ আছে সবাই মিলে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যৌথ কমিশন গঠন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬টি দেশ নিয়ে একইভাবে মেকং রিভার কমিশন কাজ করছে। অথচ এ অঞ্চলে এরকম কিছু হয়নি। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন একটি আছে, তার বৈঠকও হয়, কিন্তু অগ্রগতি কিছু নেই। কারণ এসকল বিষয়ে ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই।

ট্রানজিট ও কানেকটিভিটি প্রসঙ্গে

ট্রানজিট ভারত বহুদিন আগে থেকেই চেয়ে আসছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ভারতের সাতটি রাজ্যের (আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও অরুণাচল) সাথে তার কেন্দ্রের যোগাযোগ বাংলাদেশের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে সুবিধাজনক। এতে ভারতের এক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব কমে যায়। ফলে ভারত এর জন্য বহুদিন ধরেই বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এবার ট্রানজিটকেই শুধু নাম পাল্টে দিয়ে কানেকটিভিটি করা হয়েছে। এবার ভারত সেই সুবিধা পেল। কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু হলো। অতি সত্ত্বর পণ্য পরিবহনও শুরু হবে। সবচেয়ে অবাক করা কথা এই পণ্য পরিবহনে ভারত সরকার বাংলাদেশের রাস্তা ব্যবহার করবে। তাতে তার অনেক খরচ বাঁচবে। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই একদেশের পণ্য আরেকদেশে ঢুকলে যে শুল্ক দিতে হয়, ভারতের সাথে সেই শুল্কের ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়নি, অর্থাৎ বিনাশুল্কে ভারতের এক জায়গা থেকে পণ্য বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে অন্য জায়গায় প্রবেশ করবে। ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার আগে রাজনৈতিক বিবেচনা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অবকাঠামোগত সামর্থ্য ও অর্থনৈতিক লাভালাভ বিবেচনা করে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। ভারত সমুদ্রসীমাবিহীন স্থলবেষ্টিত কোনো দেশ নয়। ফলে ভারতকে ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ আইনগত ও নৈতিক দিক থেকে বাধ্য নয়। তবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ পেলে ভারতের দু'অংশের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়, অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় হাজার হাজার ভারতীয় যানবাহন চলাচলের ভার বহনের ক্ষমতা কতটুকু আছে? ট্রানজিটের জন্য নতুন রাস্তা ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে গেলে সীমিত কৃষিজমির ওপর চাপ পড়বে। এর সাথে পরিবেশগত ও নিরাপত্তা ঝুঁকি কতটুকু, অবকাঠামো নির্মাণে কত পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, তা তুলতে কতদিন লাগবে, বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে কি না – ট্রানজিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় যাবার আগে এসব বিষয় খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার ছিল। সামরিক উদ্দেশ্যে এ সুযোগ যেন ব্যবহৃত না হয় এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব যাতে হুমকির মুখে না পড়ে সর্বাগ্রে তা নিশ্চিত করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা ও সমমর্যাদাপূর্ণ মনোভাব থাকলেই একমাত্র এ ধরনের সহযোগিতার বিষয় বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের দুর্বল দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের শাসকশ্রেণীর আধিপত্যবাদী রাজনীতির কারণে সেই পরিবেশ এ মুহূর্তে নেই। সীমান্তে হত্যা ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এই পরিবেশ নির্মাণ সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই, দুদেশের জনগণের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে মূল ভূখণ্ডের মানুষের যাতায়াতের ধারণার আমরা বিরোধী নই। ব্রিটিশ আমলে এই পুরো অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পরও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ ছিল। যুদ্ধের পর দুই দেশের শাসকগোষ্ঠী পরস্পরকে 'শত্রু রাষ্ট্র' গণ্য করে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহ্যগত যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাংলাদেশ-ভারতের জনগণের মৈত্রী দৃঢ় করতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রেলওয়ের মাধ্যমে (বাংলাদেশের সড়ক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে) ভারতের দু'অংশের মানুষের যাতায়াতের সুযোগ দেয়া ভুল কিছু নয়। কিন্তু ভারতীয় শাসকদের উদ্দেশ্য দুদেশের জনসাধারণের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, তারা সেদেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহনের সুবিধা চায়। এবং সেটাই এবারের চুক্তিতে হয়েছে। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের পণ্য পরিবহনের অবাধ সুযোগ এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ভবিষ্যতের দুর্ভোগের বড় কারণ হতে পারে।

প্রতিবেশীর ওপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার করা ভারতের সাথে কোনো চুক্তিতে যেতে হলে কিছু বিবেচনা মাথায় রাখা উচিত নয় কি?

ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে তার পারস্পরিক আস্থা ও মর্যাদার সম্পর্ক নেই। ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই তো গত ৯ জুন শেষ রাতে মায়ানমারের সীমানা পেরিয়ে সে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত এন এস সি এন-খাপলাং শিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে। এভাবে আরেক দেশের সীমানা অতিক্রম করে আক্রমণ করা খুবই ন্যাক্কারজনক। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পর ভারত ঘোষণা দিয়েছে, তাদের প্রয়োজনে যে দেশেই এ প্রক্রিয়ায় ঢুকতে হয়, তারা ঢুকবে। এ ঘটনাটি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মনে প্রশ্ন ও শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষেকে পরাস্ত করার জন্য বিরোধী দলগুলোকে মদত দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্তারা, এই অভিযোগ প্রকাশ্যে করেছেন পরাজিত রাজাপক্ষে। নেপালে ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণকাজে ভারতীয় সেনার ভূমিকায় নেপাল সরকারের ক্ষোভ ও ভারতীয় সেনাদের নেপাল ত্যাগ করার ফরমান জারি তো অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। এরও আগে সিকিম দখল করে নেয়া, মালদ্বীপে ক্যু'র মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন ঘটানো প্রভৃতি ঘটনায় ভারতের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এরূপ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার করা একটি দেশের সাথে ট্রানজিট সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার আগে একটু ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। চীন এখন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। আমেরিকা, ইউরোপ সবাইকেই চীনের কাছে যেতে হচ্ছে ঋণের জন্য। কারণ তার আছে বিপুল পরিমাণ ডলারের রিজার্ভ। আবার চীন নিজেও তার প্রভাব বিস্তার করছে। দক্ষিণ-পূর্ব চীন সাগরে চীন কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ করছে। একটি যুদ্ধ ঘাঁটি হিসেবে সে দ্বীপটিকে গড়ে তুলছে। বিষয়টিকে একটি ঝুঁকি হিসেবে নিয়েছে আমেরিকা। চীনকে তারা সতর্ক করে দিয়েছে। *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গ্রিস : নয়া উদারনৈতিক বিকল্পের ব্যর্থতাকে প্রকট করল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পুঁজিবাদী দেশগুলোর ঘটনা বলেই এতদিন জানা ছিল। কিন্তু গ্রিসের ঘটনা আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে – ঋণের এই ফাঁদ থেকে আজ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর রেহাই নেই। পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকট আজ তাদের গ্রাস করছে। তাদের অর্থনীতিরও টালমাটাল অবস্থা। তারাও আজ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঋণ বাজারে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করছে। কিন্তু বাঁচার পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া সম্ভবও নয়।

পুঁজিবাদী সংকট প্রসঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা শিক্ষা আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের প্রয়োজন, তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন এবং সেই অনুযায়ী বণ্টন – এ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরনই নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরন হচ্ছে – বাজারের চাহিদা, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, আমি বিক্রি করে কত লাভ করব, সোজা কথায় এই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুনিয়াদ। তাই বাজারের যদি স্থায়িত্ব না থাকে তা হলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি টলটলায়মান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, হাজার সংকট সত্ত্বেও বহু মন্দা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী বাজার বরাবর একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু এবার বিশ্বযুদ্ধের পরে যে সংকট সে এবেলা ওবেলার সংকট। পূর্বেকার আপেক্ষিক স্থায়িত্বের নিয়ম পুঁজিবাদী বাজারে আজ আর নেই। সেটা শেষ হয়ে গেছে' (রচনাবলী, খণ্ড-৪,পৃ:-৩৪)। পুঁজিবাদী বিশ্ব বাজারের যেকোনও সংকটকে বোঝার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাকে মনে রাখা দরকার। গ্রিসের সংকটও তার ব্যতিক্রম নয়।

আয়ের থেকে যখন ব্যয় বেশি হয় তখন মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়। এই ঋণ পরিশোধের জন্য সে সম্পত্তি বিক্রি করে, উচ্চ সুদে টাকা ধার করে, এইভাবে সে ক্রমাগত ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকে – সর্বস্বান্ত হয়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের সাথে সরকারের পার্থক্য আছে। সরকার টাকা ছাপতে পারে, বাজারে ঋণপত্র ছাড়তে পারে। এই ঋণ আভ্যন্তরীণও হতে পারে, আবার বৈদেশিকও হতে পারে। কিন্তু সরকার যদি আয় ব্যয়ের পার্থক্য কমাতে না পারে, যদি এই পার্থক্য ক্রমাগত বাড়তেই থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই ঋণের বোঝা বাড়তে থাকবে এবং সরকারকেও আরও বেশি বেশি ধার করতে হবে। এইভাবে সরকার ক্রমাগত ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য আরও বেশি ঋণদাতাদের দুয়ারে গিয়ে হাত পাততে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে এই ঋণের ফাঁদ থেকে সরকার আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু সরকারের এই সর্বনাশ ঋণদাতা সংস্থাগুলোর পক্ষে পৌষমাস। তারা সরকারের এই সংকটকে আরও মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করবে, আরও নতুন নতুন শর্ত চাপাবে, আরও ঋণের ফাঁস সরকারের গলায় জোর করে পরিয়ে দেবে। একের সংকট অন্যের মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত হবে। গ্রিসের ক্ষেত্রেও এটাই দেখা যাচ্ছে।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত গ্রিসের ব্যবসা বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। অন্যান্য ক্ষেত্রও কড়া সরকারি নজরদারির অধীনে ছিল। এই বছরই গ্রিস তাদের জাতীয় মুদ্রা হিসাবে 'ইউরো'-কে গ্রহণ করে। সাথে সাথে বিশ্বায়নের নানা শর্তও তার অর্থনীতিকে গ্রাস করতে থাকে। অর্থনীতির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত আলগা হয়, বেসরকারিকরণের রাজত্ব শুরু হয়, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো এক এক করে চলে যেতে থাকে গ্রিসের বহুজাতিক পুঁজির হাতে। তাদের উপর আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ক্রমাগত কমতে থাকে। গ্রিসের বহুজাতিক পুঁজিকে ঢালাও সুবিধা দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অন্যদিকে জনগণের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকে ট্যাক্সের বোঝা, বাড়ে বেকারি ও জিনিসপত্রের দাম। লক্ষণীয়ভাবে গ্রিসের সামরিক বাজেটও বাড়তে থাকে। এই বাজেটের বেশি অংশই ব্যয় হয় ফ্রান্স থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র কিনতে। ফলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে ঘাটতি বাজেটের বোঝা। আর এই ঘাটতি মেটাতে গ্রিস সরকার দেদার হস্তে ঋণ গ্রহণ করতে থাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থার কাছ থেকে। দেখা যায় গ্রিসের জাতীয় উৎপাদন থেকেও তার ঋণের পরিমাণ বেশি। ২০০১ সালে গ্রিসের ঋণ ছিল জাতীয় উৎপাদনের ১০৬ শতাংশ, ২০০৯ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১২৬ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে হয় জাতীয় উৎপাদনের ১৭৩ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে তত বাজেট ঘাটতি বাড়ছে। যত বাজেট ঘাটতি বাড়ছে তত বেশি বেশি ঋণ করতে হচ্ছে। আবার সেই ঋণ শোধ করতে আরও বেশি ঋণ করতে হচ্ছে।

সংকটগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত গ্রিস অর্থনীতিকে উদ্ধার (বেল আউট) করার জন্য ইতিপূর্বে ঋণদানকারী সংস্থাগুলো গ্রিস সরকারকে ২৪০ কোটি ইউরো ধার দিয়েছিল। বিনিময়ে গ্রিস সরকারকে ওদের নির্দেশ মতো কৃচ্ছ সাধনের যে নয়া উদারনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল তার ফলে গ্রিসের যুবকদের ৬০ শতাংশ এখন বেকার, সংকট শুরু হওয়ার পর থেকে আত্মহত্যার পরিমাণ হয়েছে দ্বিগুণ, গৃহহীন মানুষের সংখ্যা হয়েছে অগুন্তি আর ৩৩ শতাংশ শিশু বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে গ্রিসই এখন গরিব দেশগুলোর অন্যতম। কিন্তু ঋণদাতা সংগঠনগুলোর শর্তানুযায়ী কঠোর

বিশ্বব্যাংকসহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর শর্তের বিরুদ্ধে গ্রিসের মানুষ

কৃচ্ছ সাধন করেও সংকট থেকে মুক্ত হতে পারল না গ্রিস। বরং সে গিয়ে পড়ল আরও বড় সংকটের গহ্বরে। তার অবস্থা এমন যে এখনই ৭২০ কোটি ইউরো দরকার। ঋণদাতা সংস্থাগুলো যে ঋণ দিতে অরাজি তাও নয়। তারা আগামী পাঁচ মাসে ১২০০ কোটি ইউরো দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮০ কোটি ইউরো তারা এখনই দিতে রাজি। কিন্তু এই অর্থ পেতে হলে গ্রিসকে কয়েকটা কড়া শর্ত মেনে চলতে হবে। এই শর্ত হল পেনশন কমানো, যুক্তমূল্য কর বাড়ানো, ব্যাপক বেতন কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব অর্থাৎ শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি হ্রাস। এসবের সাথে বড় হুমকি – শর্ত না মানলে ঋণ পাবে না, ঋণ শোধ দিতে না পারলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা যাবে না।

এই প্রস্তাব গ্রিসের বর্তমান সিপ্রাস সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। করের বোঝা কমানো, ছাঁটাই না করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ইত্যাদি জনকল্যাণকামী প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে সিপ্রাস সরকার। ইউরোপীয় জোনের ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কৃচ্ছ সাধনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গ্রিসের জনগণের প্রবল বিক্ষোভ সিপ্রাস সরকারকেও প্রবল চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। সিপ্রাস সরকারের এখন উভয় সংকট। কঠিন শর্তে ঋণ না নিলে দেউলিয়া হতে হবে। আবার ঋণ নিলেও সংকট থেকে শেষ বিচারে রেহাই মিলবে না বরং বাড়তি পাওনা হবে জনগণের প্রবল ক্ষোভ ও অসন্তোষ। কৌশল করে সরকার তাই বল ঠেলে দেয় জনগণের কোর্টে। রায় দানের দায়িত্ব গ্রিসের জনগণের কাঁধে চাপিয়ে সিপ্রাস সরকার যে পরিত্রাণের পথ খুঁজলেন তাতে সরকার বাঁচতে পারে কিন্তু গ্রিসের অর্থনীতি বাঁচবে কি?

ইউরোপের ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর কর্তাব্যক্তিরা গ্রিসের এই সংকটের জন্য সেখানকার অর্থনীতির পরিচালকদের ঘাড়ে সমস্ত দায়ভার চাপাতে চাইছে। অর্থাৎ বিষয়টা যেন এমন পরিচালকেরা যোগ্য হলেই এই সংকটে পড়তে হতো না গ্রিসকে। যদি তর্কের খাতিরে ইউরো জোনের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্যকে সঠিক বলে ধরেও নিই তা হলেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, সাইপ্রাস, ইটালি, স্পেন – এই সব দেশের অর্থনীতির পরিচালকেরা সবাই একসাথে অযোগ্য হয়ে পড়লেন! বোঝা যায়, অযোগ্যতার এই যুক্তি (!) ধোপে টেঁকে না। এ সমস্যার আসল কারণ থেকে জনগণের চোখকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলী পরিকল্পনা।

গ্রিসের ঋণ সংকট ও পরবর্তী ঘটনা দুটি বৈশিষ্ট্য দেখাল। প্রথমত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠনের সময় 'এক ইউরোপ'কে অনেকটা 'এক জাতি এক প্রাণ'-এর মতো করে প্রবক্তারা উপস্থিত করেছিল। এর দ্বারা ইউরোপীয় জনগণের জীবনে 'প্রগতি ও উন্নতির' জোয়ার বইবে এমন কথাও বলা হয়েছিল। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মানদণ্ডে দেখিয়েছিলাম, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বাস্তবে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণির একটি প্রতিক্রিয়াশীল জোট। এর সকল সদস্য রাষ্ট্রই সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে বলে ঐক্যের যে বেলুন ওড়ানো হয়, তাও ছিল মিথ্যের ফানুস। এধরনের পুঁজিবাদী জোটে সর্বদা সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই কবজা বা কর্তৃত্ব কায়েম হয়, যার পুঁজির জোর বেশি। এক্ষেত্রে তাই জার্মান একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য কায়েম হয়েছে ই-ইউতে। এর সুযোগ নিয়ে জার্মানি তার ক্ষমতা ও আধিপত্য বাড়িয়েছে– গোটা পূর্ব ইউরোপে জার্মান পুঁজির আধিপত্য বেড়েছে। তার পরই আছে ফরাসি পুঁজির ও শক্তির দাপট। বাকি ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কোনও ভূমিকাই নেই বলা যায়। তারা অনেকটা প্রজার মতো। এসব দেশের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনও উন্নতিই 'ই-ইউ' গঠনের দ্বারা হয় নি, হওয়ার কথাও নয়।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মূলকথা – নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি। কেইনসীয় পুঁজিবাদী দাওয়াইয়ে সংকট যখন মেটানো গেল না, তখন এল এই দাওয়াই, যাকে সাহায্য করল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, জনগণের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প নয় – সবই বেসরকারি মালিকানায় ও বাজারের উপর ছেড়ে দাও। পুঁজিপতিদের উপর কর কমাও, তাহলে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে। বাস্তবে কিছুই হল না। কারণ, পুঁজি উৎপাদন ছেড়ে ছুটল ফাটকায়। পণ্য উৎপাদন ছেড়ে পুঁজি এখন খাটছে টাকা কড়ির ব্যবসায়, রিয়েল এস্টেটে। টাকা কড়ির ও ঋণের ব্যবসায় ফাটকাবাজি ২০০৮ সালে বিশ্বজোড়া সংকট ডেকে আনল, মন্দার কোপে পড়ল সারা পুঁজিবাদী দুনিয়া। যার হাত থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছে না বিশ্ব পুঁজিবাদ। কেইনসীয় ফর্মূলা রাষ্ট্রের যে ঋণগ্রস্ততা তৈরি করেছিল, তার হাত থেকে বেরোবার জন্য নয়া উদারবাদী ফর্মূলায় কাজ হল না কিছুই, উল্টে বাজার সংকট, অতি উৎপাদনের সংকট – মহান মার্কসের ব্যাখ্যাকে সত্য প্রমাণ করে বিকট আকারে দেখা দিয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ স্টিগলিজ, ক্রুবম্যানদের পরামর্শ মেনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো কি আবার কেইনসে ফিরবে? একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনও পুঁজিবাদী ফর্মুলাই বিশ্ব পুঁজিবাদকে বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। গণভোটে সরাসরি 'না'-এর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করার জন্য গ্রিসের জনগণকে অভিনন্দন জানাই।

[সূত্র : সাপ্তাহিক গণদাবী, ১০-১৬ জুলাই ২০১৫]

মোদীরা এদেশে কল্যাণের জন্য আসে না

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) এদিকে চীন ও রাশিয়ার সাথে মিলে ভারত ব্রিকস্ গঠন করলেও আমেরিকার সাথে ভারতের ভাল বোঝাপড়া আছে। ভারতের সীমান্তে চীনের অবস্থান ভারতের জন্য সুখকর নয়। ফলে এ আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, ভারতের উত্তর-পূর্বে যে চীন সীমান্ত, যে কোনো সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সেখানে সৈন্য সমাবেশ করতে হলে এই ট্রানজিট রোডই সবচেয়ে কার্যকরী হিসেবে ভারত বেছে নেবে। এটি ঘটবেই তা আমরা বলছি না। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এই বিষয়টিকে ভেবে দেখার জন্য বলছি। কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের অসহিষ্ণু আচরণের কিছু নজির আমরা তুলে ধরেছি। আর সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র যারা বোঝেন তারা আমাদের আশঙ্কা একেবারে অমূলক মনে করবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সবচেয়ে আশংকার কথা, সেই উত্তপ্ত সময়ে এ ব্যাপারে ভারতকে বাধা দেবার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। চীন-ভারত দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের অবস্থান নিরপেক্ষ থাকাই বাঞ্চনীয়। তা না হয়ে কোনো একদিকে বাংলাদেশ জড়িয়ে গেলে তা এদেশের ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয়।

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা জনগণ প্রত্যক্ষ আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে তাদের ক্ষোভও অনেক বেশি। বিশেষ করে বহু অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসা না করা, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, সর্বোপরি জনগণের ওপর চেপে বসা অন্যায়, অগণতান্ত্রিক সরকারের পেছনে ভারতের সরাসরি সমর্থন-এ সবের কারণে মানুষের মনে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রবল। কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে, আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি-জামাত জোট, যারাই ক্ষমতায় থাকুক না কেন - ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা তারা কেউই করবেনা। কারণ এদেশের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা। এখানকার পুঁজিপতিরা ভারতীয় পুঁজিবাদের সাথে কোলাবরেশনে কিছু মুনাফা তুলতে চান। দেশ তাদের জন্য কিছু না। তারা তাদের মুনাফার প্রশ্ন যুক্ত থাকলে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দেবেন, ঠিক তেমনি সামান্য মুনাফার খোঁজ পেলে দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব কিছুরই তোয়াক্কা করবেন না। ফলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কথা দেশের বুর্জোয়াদের কাছে একটি কথা মাত্র। বিশ্বের কোন দেশের বুর্জোয়ারাই আজ আর নিজ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের ধার ধারেনা। মুনাফার প্রয়োজনে, পুঁজির বৃদ্ধি কিংবা রক্ষার প্রয়োজনে দেশের সবরকম স্বাধিকারের নীতি পদদলিত করতে তাদের মুহূর্তও বাধবেনা। আবার ভারত ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে এ দেশের উপর তার সবরকম খবরদারি চালাবে। এর বিরুদ্ধে লড়তে হলে গোটা দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেটা আওয়ামী লীগ-বিএনপির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে জনগণকে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ও সাহসী হতে হবে।

এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করা মানে ভারতীয় জনগণের বিরোধীতা করা নয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ নিজের দেশের জনগণের উপর চরম অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে এসেছে। সে দেশে চাষীরা আত্মহত্যা করছে। লে-অফ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারত্ব সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা। এসবের বিরুদ্ধে সেখানকার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষরা লড়ছেন, শ্রমিক-কৃষকরা লড়ছে। ভারতের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। তাই ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ভারতীয় জনগণ আমাদের বন্ধু। মনে রাখা দরকার ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবকে ভিত্তি করে একটি শ্রেণী মানুষের মধ্যে উগ্র ভারতবিরোধীতা ছড়িয়ে দিতে চায়। তারা তার সবরকম চেষ্টাও করছে। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে তারা তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সবরকম ফায়দা হাসিল করতে চায়। দেশের জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। এজন্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখতে হবে।

শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মনুষ্যোচিত মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ জুলাই বিকেল ৪টায় ২২/১ তোপখানা রোডের সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মিছিল ও সমাবেশ পরিবর্তন করা হয়। সংগঠনের মহানগর সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, মানস নন্দী, উজ্জল রায়, কল্যাণ দত্ত, রাজু আহমেদ, রাজীব চক্রবর্ত্তী। সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে শ্রমজীবী মানুষের অবদানে। কৃষি-শিল্প-সেবা ক্ষেত্রে এদের শ্রমে-ঘামে জাতীয় উৎপাদন বেড়ে চলেছে। কিন্তু তাদের জীবন দুঃস্বপ্নে পরিণত। নিম্ন মজুরী, বেকারত্ব, ক্ষুধা, অভাব, ছাঁটাই, নির্যাতন তাদের নিত্যসঙ্গী। যতক্ষণ এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল আছে, ততক্ষণ কাজের নিশ্চয়তা, ন্যায্য মজুরি, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের জন্য আমাদের লড়তে হবে। তবে শুধুমাত্র এই সংগ্রামেই শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আসবে না। পাশাপাশি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতন্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপোষহীন বিপ-বী ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একই সাথে নেতৃবৃন্দ ঈদের ১০ দিন আগে শ্রমিকদের বেতন ও বেতনের সমপরিমাণ বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবি জানান।

সিলেট : ফেডারেশনের সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১২জুলাই বিকাল ৪টায় নগরীতে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সংগঠনের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আম্বরখানা পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সংগঠন সিলেট জেলা শাখার সভাপতি সুশান্ত সিনহার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুখলেছুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার সদস্য এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, সংগঠনের সহ-সভাপতি হৃদেশ মুদি, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সাইদুল, এড. উজ্জ্বল রায়।

চা শ্রমিক ফেডারেশনের শ্রমমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

অবিলম্বে নতুন চুক্তি সম্পাদন, দৈনিক মজুরি ৩শ টাকা প্রদান ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার দাবি

সিলেট : অবিলম্বে নতুন চুক্তি সম্পাদন, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণ, সপ্তাহে ৫ কেজি চাল, প্রতি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, স্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, ইকনোমিক জোনের নামে চান্দপুর চা বাগানের ভূমি অধিগ্রহণ বাতিলসহ ১১ দফা দাবিতে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা ২৮ জুন '১৫ দুপুর ১২টায় সিলেটের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে সিলেটের বিভিন্ন চা বাগান থেকে আগত চা শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিসম্বলিত ফেস্টুনসহ মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি লাক্কাতুরা চা বাগান থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার আহবায়ক বীরেন সিং এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, মালনীছড়া বাগান শাখার সভাপতি সন্তোষ নায়েক, লাক্কাতুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক লাংকাট লোহার।

সভায় বক্তরা বলেন, উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর মাত্র ৬৯ টাকা মজুরি দিয়ে নূন্যতম পুষ্টির চাহিদা পূরণ তো দূরের কথা, ক্ষুধার অন্নটুকু পর্যন্ত জোটে না। এর সাথে রোগ-বালাই তো লেগেই আছে। প্রায় ৮ মাস আগে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় সকল পক্ষ বলেছিলেন দ্রুত নতুন চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন, নির্ধারণ করবেন মানবোচিত মজুরি। কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তাই অবিলম্বে নতুন চুক্তি সম্পাদন ও ৩০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ, ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ সহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাবেশ শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শত শত চা শ্রমিকদের স্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

এদিকে সমাবেশ চলাকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কর্মচারী ইউসুফের নেতৃত্বে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী সমাবেশে উপস্থিত চা শ্রমিকদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। হামলায় চা শ্রমিক ফেডারেশন লাক্কাতুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক লাংকাট লোহার, অজিত দাশ, শিলা কুর্মীসহ ৭ জন শ্রমিক আহত হন। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও চা শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মৌলভীবাজার : চা শ্রমিক ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ জুন দুপুর ১২টায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালন করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৬৬টি চা বাগানের মধ্যে মাত্র ৬টি তে সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় আছে। অথচ সংবিধানে সবার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। দুই বছর পর পর চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও ২০০৯ সালের পর আজ ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও নতুন চুক্তি হচ্ছে না।

হবিগঞ্জ : ২৮ জুন সকাল ১১টায় চা শ্রমিক ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমমন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পূর্ব থেকে রশিদপুর, লস্করপুর, চান্দপুর, দেউন্দী, বেগম খান, চন্ডীচড়া, আমু, সাতছড়ীসহ বিভিন্ন চা বাগানে ১১ দফা দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক চা শ্রমিক নেতা ময়না রবি দাস ও শিবলাল এর নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কবাদী) হবিগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক শফিকুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্ট বৃন্দাবন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে নতুন চুক্তিসহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও দেউন্দী চা বাগানে ৫ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের মাধ্যমে উত্থাপিত দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

বাঁধাই শ্রমিকদের ঈদ বোনাসের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ

বাঁধাই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সূত্রাপুর থানা শাখার উদ্যোগে ৩ জুলাই বিকাল ৩টায় বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে সমাবেশ ও বাংলাবাজার, ডালপট্টি মোড়, লক্ষ্মীবাজার এলাকায় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের থানা সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও সংগঠক মানিক হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উজ্জল রায়, ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাসুদ রানা, বাঁধাই শ্রমিক জামিল হোসেন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাঁধাই শ্রমিকরা ঈদের কোনো বোনাস পায় না। তাঁরা যে মজুরি পায় তা দিয়ে সংসার চলে না।

লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থে দেশ পরিচালনা রুখে দাঁড়ান

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমরেড মানস নন্দী বলেন, রোজার মাসের শুরুতেই সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে। সরকার কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। রাজধানীসহ সারাদেশে গাড়িভাড়া-বাড়িভাড়া নিয়ে মালিকদের যে নৈরাজ্য চলছে, তার বিরুদ্ধে সরকারের কোনো তৎপরতা নেই। ঈদ যত ঘনিয়ে আছে তত সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠছে, গণপরিবহন বলে কিছু নেই। সমস্ত পরিবহন সেক্টর বাস-লঞ্চ মালিকদের হাতে জিম্মি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা বলে কিছু নেই, প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক আর ল্যাব মালিকরা এখন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কি ভয়াবহ নৈরাজ্য ও দুর্নীতি বিরাজ করছে তার প্রমাণ পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস, উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে হয়রানি, লাগামহীন বেতন-ফি বৃদ্ধি ও শিক্ষার বেসরকারিকরণ। তিনি গার্মেন্ট শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের ঈদের আগে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করার দাবি জানান।

কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ বলেন, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না, গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর কোনো কাজ নেই, তারা বছরে ৯ মাসই বেকার থাকে। কাবিখা-কাবিটা নিয়ে চলছে চরম দুর্নীতি ও লুটপাট। তিনি কৃষকদের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ এবং হাটে হাটে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র চালুর দাবি জানান।

২০ রোজার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি

২০ রোজার মধ্যে সকল শ্রমিকদের বেতন ও বেতনের সমপরিমাণ বোনাস দেয়ার দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৬ জুন শুক্রবার বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের মহানগর সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়, কল্যাণ দত্ত প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রতি বছরই দেখা যায় ঈদের পূর্ব দিন বেতন পায় অনেক শ্রমিক, কিছু শ্রমিক তাও পায় না। তারা বেতনের টাকা দিয়ে আর সেমাই চিনি কেনার সময় পায় না, সন্তানদের জামা-কাপড় কিনে দিতে পারে না। শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এখনো মালিকের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে, বাঁধাই শ্রমিকসহ অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা কোনো বোনাস পায় না। ওদিকে শেষ মুহূর্তে বেতন পেয়ে বাড়ি যেতে গিয়ে পরিবহন সিন্ডিকেটের কারসাজিতে দ্বিগুণ ভাড়া গুণতে হয়। দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমিকের অবদান সবচেয়ে বেশি, অথচ একদিকে তারা মানুষের মতো বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে পরিবার-পরিজন নিয়ে উৎসবের আনন্দ তারা করতে পারে না।

সিলেট : ঈদের পূর্বে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখা ২৬ জুন মিছিল সমাবেশ করে। বিকাল ৩টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সংগঠন সিলেট জেলার সভাপতি সুশান্ত সিন-হার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুখলেছুর রহমানের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার আহ্বায়ক বীরেন সিং, সাজিদুল ইসলাম, এড. উজ্জ্বল রায়, মহিতোষ দেব মলয়।

রংপুর : ২০ রোজার মধ্যে বেতন-বোনাস প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ জুন সকাল ১১টায় স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সংগঠক পলাশ কান্তি নাগের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, শাহীদুল ইসলাম সুমন, মহেদুল ইসলাম, সুজন রায়।

ধর্ষণকারীদের বিচারের দাবিতে ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম : নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ঢাকায় আদিবাসী-গারো নারীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ও জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে নগরীর নিউ মার্কেট চত্বরে ১৭ জুন বিকাল ৫ টায় এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংহতি জানায় চিটাগং গারো ইয়ুথ এসেম্বলী। জেলা সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি তাজ নাহার রিপন, গারো ইয়ুথ এসেম্বলীর সহ-সভাপতি প্রমোদ জাম্বিল, নারীমুক্তি কেন্দ্রের সহ-সভাপতি জান্নাতুল ফেরদাউস পপি। সমাবেশ পরিচালনা করেন জুলায়খা আখতার।

যশোর : ১১ জুন বিকাল সাড়ে ৪টায় যশোর ইনস্টিটিউটের নাট্যকলা সংসদ মিলনায়তনে ছাত্র ফ্রন্ট ও নারীমুক্তি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধে চাই গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্র যশোর জেলার আহ্বায়ক নাসিমা আক্তার লাতিন, পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট নেতা কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড হাসিনুর রহমান, যশোর ইনস্টিটিউটের সাবেক সম্পাদক ও ব্যাংকার মোস্তাফিজুর রহমান কাবুল, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট যশোর শাখার সহকারী পরিচালক বিপ্লব মণ্ডল, শিক্ষক সোনিয়া সাইদান নাহার, এম এস টি পি গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদাউস ঈশা।

গাইবান্ধা : ৩০ মে শিশু কিশোর মেলা ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে গাইবান্ধার দারিয়াপুর চৌমাথায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী)-র দারিয়াপুর অঞ্চল শাখার আহবায়ক জোব্বার হোসেন, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, মাহবুব আলম মিলন, রাহেলা সিদ্দিকা, বন্ধন প্রমুখ।

রংপুর : ১৪ জুন ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে নারী নির্যাতন বিরোধী ছাত্রসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় অন্নদামোহন হলে কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি কল্যাণ দত্ত, জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র-এর কামরুন্নাহার খানম শিখা, হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড।

তিস্তাসহ নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ছাড়া সুসম্পর্কের কথা বলা প্রহসন

- মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ৩ জুন সংবাদমাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সুসম্পর্কের ডংকা বাজানো হলেও বাংলাদেশের জনগণের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় এই সফরের আলোচ্যসূচিতেই নেই।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে যে ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল তা ৪৪ বছর পরে বাস্তবায়ন করে প্রচারের জোরে একেই বিরাট অর্জন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। আর এই 'বদান্যতা'র বিনিময়ে আওয়ামী মহাজোট সরকার কানেকটিভিটি-র নামে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন অর্থাৎ করিডোর সুবিধা দিতে চলেছে। কানেকটিভিটি বা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার আগে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে ভারতের কাছ থেকে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। একই সাথে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রত্যাহারে ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প এবং সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উৎস বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা প্রয়োজন। অভিন্ন নদীর পানি বাংলাদেশের 'ন্যাচারাল রাইট' ও ন্যায্য পাওনা। ভারত সরকার একতরফা পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের নদীব্যবস্থাকে বিপন্ন করেছে এবং নানা অজুহাতে অভিন্ন নদীগুলোর পানি-নবন্টন আলোচনা ঝুলিয়ে রেখে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করেছে। এই নীতি অব্যাহত রেখে সুসম্পর্কের কথা বলা প্রহসন মাত্র।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "ভারতকে ট্রানজিট-এর নামে করিডোর দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাজনৈতিক বিবেচনা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অবকাঠামোগত সামর্থ্য ও অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করা উচিত। ভারত সমুদ্রসীমাবিহীন স্থলবেষ্টিত কোনো দেশ নয়। ফলে ভারতকে ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ আইনগত ও নৈতিক দিক থেকে বাধ্য নয়। তবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ পেলে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়, অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয়। দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমমর্যাদাপূর্ণ মনোভাব থাকলেই একমাত্র এ ধরনের সহযোগিতার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের দুর্বল দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের শাসকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী রাজনীতির কারণে সেই পরিবেশ এ মুহূর্তে নেই। ট্রানজিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় যাবার আগে নিশ্চিত করতে হবে – সামরিক উদ্দেশ্যে এ সুযোগ যেন ব্যবহৃত না হয় এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব যাতে হুমকির মুখে না পড়ে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশ-ভারতের জনগণের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও মৈত্রী দৃঢ় করতে রেলওয়ের মাধ্যমে (বাংলাদেশের সড়ক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে মূল ভূখণ্ডের মানুষের যাতায়াতের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় শাসকদের মূল উদ্দেশ্য দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, তারা সেদেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহনের সুবিধা চায়।"

তিনি আরো বলেন, "ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ বাড়ানো, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে পরিবহন এবং আন্তঃদেশীয় এই গ্রিড থেকে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ প্রদান ইত্যাদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলবে যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বিনিয়োগে সুন্দরবনের পাশে রামপালে বৃহদায়তন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সুন্দরবনকে বিপদাপন্ন করার আত্মঘাতী প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।"

তিনি বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ বাড়ছে। শ্রীলংকায় সরকার পরিবর্তনে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, এমনকি নেপালের শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসন না হওয়ার ক্ষেত্রেও ভারতের প্রভাব কাজ করছে। নেপালে ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতার নামে অননুমোদিত গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ভারতের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকারকে ভারত কিভাবে মদত দিয়ে চলেছে তা সবাই জানেন। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সেদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাজার সম্প্রসারণ ও পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়াকে তার প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করতে চায়। অন্যদিকে এই অঞ্চলকে ঘিরে ভারত-চীন আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাও ক্রিয়াশীল। এই প্রেক্ষাপটে নতজানু নীতি পরিহার করে স্বাধীন অবস্থান থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পরিচালনা করার দাবিতে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে।"

তিস্তাসহ নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং জাতীয় সম্পদের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন, মোদির সফরে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সংকট তৈরি হবে যা আগামীদিনে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করবেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক ন্যায্যতা' ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা-পদ্মাসহ সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ভারত গোটা বাংলাদেশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং ১৬ কোটি মানুষের মানবিক অধিকার লংঘন করে চলেছে। সীমান্ত হত্যা নিয়ে বহু আলোচনা সত্ত্বেও তা অব্যাহত আছে। এসব সমস্যার সমাধান না করে মোদীর সফরকে ঘিরে আওয়ামী মহাজোট সরকারের উচ্ছ্বাস আসলে ডামাডোলের আড়ালে জনগণের অধিকার হরণেরই প্রক্রিয়া মাত্র। বিবৃতিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আমাদের শাসকদের নতজানু নীতি এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ সংগঠিত করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে নীলফামারীতে সমাবেশ

ভারতের কাছ থেকে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার ও মহাজোট সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ জুন সকাল ১১টায় স্থানীয় চৌরঙ্গী মোড়ে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির নীলফামারী জেলা সংগঠক ডা. রবীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আহসানুল আরেফিন তিতু, ডোমার উপজেলা সমন্বয়ক ইয়াসিন আদনান রাজিব, জলঢাকা উপজেলা সংগঠক তরনি রায়, ডিমলা উপজেলা সংগঠক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিন দিনাজপুর ও রংপুরে পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির সমাপ্ত

৫-৮ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত কমরেডদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

এবার রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের বিষয়বস্তু ছিল দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র। বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেডস শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মানস নন্দী, মনজুরা হক নীলা, ওবায়দুল্লাহ মুসা, উজ্জল রায় এবং ফখরুদ্দিন কবির আতিক। এছাড়া বিষয়বস্তুর উপর অংশগ্রহণকারী কমরেডগণ তাদের প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরেন। এছাড়া প্রতিদিন রাতেই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কমরেডরা দিনের আলোচনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

'মোদির বাংলাদেশ সফর : ২২ দফা চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ' শীর্ষক মতবিনিময়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আইনের আওতায় 'দায়মুক্তি'র সুযোগ নিয়ে ভারতের রিলায়েন্স ও আদানি গ্রুপের সাথে যথাক্রমে ৩ হাজার ও ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোগ না নিয়ে আধিপত্যবাদী ভারতের উপর সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎখাতকে ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল করে ফেলার এই তৎপরতা চরম অপরিণামদর্শী। ভারতের কোম্পানি এনটিপিসির কর্তৃত্বাধীন রামপালে সুন্দরবন বিনাশী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পও অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশবাসীর মতামত উপেক্ষা করে ও ইউনেসকোসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগকে আমলে না নিয়ে সরকার প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। ভারতের সাথে বিশাল বাণিজ্যিক ঘাটতি, সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের ধারাবাহিক হত্যাকান্ড, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে এবারও আশ্বাসের বাইরে বস্তুগত কিছু পাওয়া যায়নি। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে ২০০ কোটি ডলার ঋণ একদিকে ভারতেরই ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে; আর এই ঋণের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের ৭৫% কাঁচামাল ভারত থেকে আমদানি করতে হবে।

প্রতিবেশীকে তার ন্যায্য অধিকার, পাওনা ও মর্যাদা না দিলে নিজেকে সৎ প্রতিবেশী বলে দাবি করা চলে না। প্রতিবেশীকে বঞ্চিত ও নিরাপত্তাহীন রেখে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা সমাধানে ভারত কখনই সমমর্যাদা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করেনি। উল্টো ভারতে নানা মাত্রায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এই ব্যাপারে আবার নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপি ও তাদের আদর্শিক সংগঠন শিবসেনা ও আরএসএস সবার থেকে এগিয়ে। ভারত বরাবরই বাংলাদেশকে তাদের অনুগত ভূমিকায় দেখতে চেয়েছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে তাদের ব্যবস্থাপত্র ও কৌশল অনুযায়ী বাংলাদেশের কাছ থেকে তাদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়সমূহ আদায় করে নিয়েছে; ঝুলিয়ে রেখেছে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারসমূহ। গত চার দশক ধরে বাংলাদেশের সরকারসমূহের ভারত তোষণ নীতির কারণে নিজেদের ক্ষমতা নিরাপদ রাখতে যেয়ে সমস্যাসমূহের যৌক্তিক সমাধানের কার্যকরি উদ্যোগ না থাকায় জাতীয় স্বার্থ গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়েছে; ক্ষেত্র বিশেষে তা আরো জটিল হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ভারতসহ প্রতিবেশীদের সাথে সমমর্যাদা ও সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা চায়; কিন্তু কোনো অন্যায় দাবি ও আধিপত্যবাদী তৎপরতার কাছে নতি স্বীকার নয়। ভারত ও বাংলাদেশের সরকারগুলো লুটেরাদের স্বার্থে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা জিইয়ে রাখে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাসহ নানা সংকট তৈরী করে। এর বিরুদ্ধে উভয় দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম জরুরি।

মোদির সফরের প্রতিবাদ বিক্ষোভে বাধা ও গ্রেফতারের নিন্দা-প্রতিবাদ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতি নেয়ার সময় বাসদ (মার্কসবাদী)-র কার্যালয় ঘেরাও করে রাখা, বাসদ (মার্কসবাদী) কর্মী শরীফুল চৌধুরী, প্রগতি বর্মন তমা, সায়েমা আফরোজ-কে গ্রেফতার করে পরদিন আদালতে প্রেরণ, মিছিল-সমাবেশ করতে না দেয়া, পুলিশ কর্তৃক বাম মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশুর বাসভবন ঘেরাও করে রাখা ও গ্রেফতারের হুমকির ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ৬ জুন বিকাল ৪টায় বাসদ(মার্কসবাদী) ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষিত সময়ের পূর্বেই বিকাল ৩টা থেকে বাসদ(মার্কসবাদী)-র কার্যালয়ের প্রবেশমুখ পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ঘেরাও করে রাখে এবং নেতাকর্মীদের ঢুকতে-বেরোতে বাধা দেয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়কারী মোশরেফা মিশুর বাসভবন ৫ জুন রাত থেকে গোয়েন্দা পুলিশ ঘেরাও করে রাখে এবং তার মোবাইল কেড়ে নেওয়া এবং বাসা থেকে বের হওয়া মাত্র গ্রেফতারের হুমকি দিতে থাকে। এছাড়া প্রেসক্লাবের সামনে থেকে নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন-সহ ৩ জনকে এবং জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের নেতা মহিউদ্দিন আহমদসহ ৩ জন নেতাকর্মীকে আটক করে এবং তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে না দেয়ার জন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকার যেভাবে হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ করেছে তা নজিরবিহীন ও সরকারের ফ্যাসিবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করা হল। বিবৃতিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মোদির সফরে তাদের ভাষায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়ে থাকলে ভিন্নমতের প্রতি সরকার এত অসহিষ্ণু কেন?

বাম মোর্চা : গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ এক যুক্ত বিবৃতিতে মোদির সফরের সময় বাম মোর্চার কর্মসূচি করতে না দেয়া ও মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশুকে গৃহবন্দি করে রাখার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বাজেট : লুটপাটের মাত্রা আরও বাড়াবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) খাতে। প্রতিরক্ষা ধরলে তিন খাত মিলিয়ে ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ।

আসলে এ হল সরাসরি দেয়া বরাদ্দ, যা খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে। এর বাইরেও অপ্রত্যক্ষ বরাদ্দও আছে যা এসব খাতে যুক্ত হয়। বছর শেষে সংশোধনীর মাধ্যমেও আরো কিছু বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া হয়। রাজস্ব বাজেট হল বাজেটের সেই অংশ যা সরাসরি জনগণের কাছ থেকে আদায় করা টাকার ভিত্তিতে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে হল, দেশের সাধারণ মানুষের দেয়া টাকার অর্ধেকটাই চলে যায় আমলাতান্ত্রিক ও অনুৎপাদনশীল খাতে। সুতরাং, বাজেটের উদ্দেশ্য যে জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন নয় সেটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয় না।

সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ কতটুকু?

এ-সংক্রান্ত তথ্যও সরকারের কর্তাব্যক্তিরাই আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বিগত দুই যুগের মধ্যে গত দুই অর্থবছরেই স্বাস্থ্য খাত সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়েছে। কয়েকদিন আগে সংসদে তিনি বলেন, ২০১২-'১৩ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং ২০১৩-'১৪ অর্থ বছরে ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য খাতের জন্য। আর এবার জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ ৭২ হাজার ৩০২ কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্য খাত পেয়েছে ৯১ হাজার ৬৪৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৪.৩ শতাংশ মাত্র।

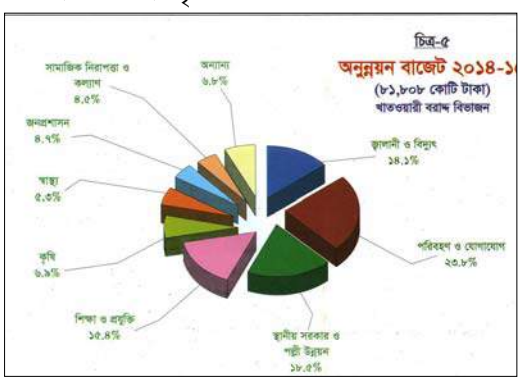

একই সত্য স্বীকার করছেন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, তিনি বলছেন : "ঘানা, কেনিয়ার মতো দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় ৩১ ভাগ। আমাদের ব্যয় সেখানে মাত্র ৪ দশমিক ৩ ভাগ।" শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, "শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য দরকার ১৬ হাজার কোটি টাকা, দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকা। এ দিয়ে বেতন দেব নাকি অবকাঠামো উন্নয়ন করব?"

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র। যে মানুষদের পক্ষে তিনবেলা পেট ভরে ভাত খাওয়াই কঠিন, তারা শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন কেমন করে মেটাবে? তাদের মৌলিক অধিকার পূরণ করা, মানবিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করাই তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু তাদের পক্ষে রাষ্ট্রী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের সুযোগও দিনে দিনে সংকুচিত করা হচ্ছে। যার অর্থ, দেশের বেশিরভাগ মানুষের প্রয়োজন বাজেটে উপেক্ষিতই থাকে।

দেশের দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে ভাঙাচোরা প্রাইমারি স্কুলগুলোতে পড়ে, সেগুলোর হাল সবারই জানা। তাদের কথা বাদ দেওয়া যাক। দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের একটা বড় অংশ এখন পড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সরকারি ও পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো নিজেদের জমি-জমা বিক্রি করে হলেও সন্তানদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। শিক্ষার এই বাণিজ্যিক ধারাকে সংকুচিত করা দূরে থাক, সরকার এই শিক্ষার্থীদের ওপর ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করার পরিকল্পনা করছে।

আসলে বাজেট আমাদের দেশে চলমান অর্থনীতিরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিফলন মাত্র। দেশের বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকয়েক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী লুটপাটকারীর পকেট ভারি করার প্রক্রিয়াই বাজেটে অনুমোদন করা হয়। কিন্তু এই সত্যটাকে 'প্রবৃদ্ধি', 'উন্নয়ন', 'গড় আয় বৃদ্ধি', 'মধ্যম আয়ের দেশ' ইত্যাদি শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়।

সাধারণ মানুষের উপরেই ট্যাক্স-ভ্যাট-করের বোঝা

এবারের বাজেটে ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকার ট্যাক্সের খাঁচার পুরে গরিব-মধ্যবিত্তকে তীব্র শোষণ করার পথ করা হয়েছে। ট্যাক্স-ভ্যাট ইত্যাদি নানা কায়দায় সরকার টাকা আদায় করে জনগণের পকেটে থেকে, আর সেটা খরচ করে আমলাতন্ত্রের পেছনে, কর ফওকুফ বা ট্যাক্স হলিডে, রপ্তানি বোনাস ইত্যাদি নানা নামে জনগণের টাকা তুলে দেয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের পকেটে। আর শিল্পপতি-ব্যবসায়ী লুটেরদের লুটপাট তো আছেই। এভাবেই জনগণের সম্পদ ধনীদের পকেটে কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া চলছে। বাজেটে এ প্রক্রিয়াটাকেই সামান্য রদবদল করে অনুমোদন করা হয় মাত্র।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বাজেটের রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় বরাদ্দ এবং সরকারি ঋণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের গতি-প্রকৃতির মাধ্যমেই বাজেটের চরিত্র বোঝা যায়। বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাত মাত্র ১০ শতাংশ। যার অর্থ হল, এ দেশের ধনী ব্যক্তিদের কর দিতে বাধ্য করার ব্যাপারে সরকারগুলোর ব্যর্থ। সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিস্তারের কারণে এ দেশে মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট), আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জের মতো পরোক্ষ করের ওপরই বাজেট প্রধানত নির্ভরশীল। ব্যবসায়ী বা আমদানিকারকরা এসব পরোক্ষ কর আদায় করতে ভূমিকা পালন করলেও তাঁরা এসব করের শুধুই 'সংগ্রহে সহায়তাকারী', পরোক্ষ করের প্রকৃত করদাতা ভোক্তা হিসেবে খুচরা ক্রেতারা।

প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সব ধরনের কর-ভ্যাট দিয়ে থাকেন দেশের সাধারণ মানুষ। তাদের দেয়া করের ওপরই বাজেট প্রণয়ন করা হয়। বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা আইনের নানা ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে কর না দেয়া অথবা কর ফাঁকি দেন। ড. মইনুলের এই বক্তব্যেরই সমর্থন ভিন্ন ভাবে পাওয়া গেল অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে। তিনি বলছেন, জিডিপির ৩ থেকে ৪ শতাংশ অপচয় হয় দুর্নীতিতে। ৩ শতাংশ ধরলেও এই অপচয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। আর টিআইবির গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, বিচার – এসব রাষ্ট্রীয় সেবামূলক ক্ষেত্রে দুর্নীতির পরিমাণ জিডিপির আড়াই শতাংশের মতো। আর রাষ্ট্রের বড় ক্রয় খাতে যোগসাজশের যে দুর্নীতি হয় তার পরিমাণ জিডিপির ৩ শতাংশের মতো। সব মিলিয়ে দুর্নীতির পরিমাণ কমপক্ষে জিডিপির ৫ শতাংশের বেশি। এই দুর্নীতি কারা করছে? সে তথ্যও কিন্তু আমাদের জানা। সম্প্রতি হলমার্ক জালিয়াতি নিয়ে বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সংসদেই বলেছেন যে দলের মধ্য থেকে 'বাধা' পাওয়ায় কারণেই এসব দুর্নীতির বিচার করা যাচ্ছে না।

সাধারণ মানুষের অর্থে লুটেরাদের প্রতিপালন

এদেশের বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী শুধু যে কর ফাঁকি দেয় তাই নয়। সাধারণ মানুষের পকেট থেকে আদায় করা টাকায় নানাভাবে তাদেরই প্রতিপালন করা হয়। সম্প্রতি দেশের ১৫ শিল্প গ্রুপের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করা হয়েছে। শিল্প গ্রুপগুলোর পক্ষে ঋণদাতা ব্যাংকই এ আবেদন করেছে। সংবাদপত্রগুলো ভাষ্য মতে, এসব গ্রুপের মালিকানার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা যেমন রয়েছেন, তেমনি আছেন ব্যবসায়ী নেতা ও দেশের আলোচিত ঋণখেলাপিদের পরিবারের সদস্যও। কয়েকটি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপের চাপে বাংলাদেশ ব্যাংক গতবছর ডিসেম্বরে বৃহৎ ঋণ পুনর্গঠনের একটি নীতিমালা তৈরি করতে বাধ্য হয়। ওই নীতিমালার আওতায় এখন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, একক গ্রুপ হিসেবে সর্বোচ্চ ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করা হয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপের পক্ষে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে সাত ব্যাংক এ গ্রুপটির প্রায় ৪ হাজার ৯৫১ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করেছে। বেক্সিমকো গ্রুপ এবং এর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমা দেশের ব্যাংকিং খাত ও শেয়ারবাজারে খুবই আলোচিত নাম। এ গ্রুপটি এর আগেও একাধিকবার খেলাপি ঋণের বিপরীতে নানা ধরনের সুবিধা নিয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রায় ১ হাজার ৪১২ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করা হয়েছে যমুনা গ্রুপের জন্য যার চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুলও একজন আলোচিত ব্যক্তি। এদের ঋণ আছে সরকারি-বেসরকারি ৮টি ব্যাংকে। ঋণ পুনর্গঠনের জন্য আবেদন করা অন্য ১২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিকদার গ্রুপের ৬৮৬ কোটি, থার্মেক্সের প্রায় ৬৬৭ কোটি, কেয়ার প্রায় ৮৭৯ কোটি, এস এ গ্রুপের প্রায় ৭১৯ কোটি, আব্দুল মোনেমের প্রায় ৪৯৭ কোটি, বিআর স্পিনিংয়ের ৪৭৩ কোটি, রতনপুর গ্রুপের ৪৩৫ কোটি, ইব্রাহিম গ্রুপের ৩৪০ কোটি, নাসা গ্রুপের ২০০ কোটি, গিভেন্সির ৬০ কোটি, দেশবন্ধুর প্রায় ৫৭ কোটি এবং ক্যান-অ্যাম প্রায় ১৫ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠনের জন্য আবেদন করেছে।

গ্রুপের নাম	ঋণ (কোটি টাকা)
বেক্সিমকো	৪,৯৫১
যমুনা	১,৪১১
এননটেক্স	১,০৯৪
কেয়া	৮৭৯
এসএ	৭১৮
শিকদার	৬৮৬
থার্মেক্স	৬৬৬

এই লুটপাটকারীদের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে বাজেটে সংশোধনী এনে করের পরিমাণ কমানো হয়েছে। বাজেট ঘোষণায় সব ধরনের পণ্যে রফতানির ওপর ১ শতাংশ উৎসে কর কাটার প্রস্তাব করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। অথচ বাজেট অনুমোদনের সময় তা কমিয়ে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ ১০০ টাকা রফতানি আয় হলে তার বিনিময়ে ৬০ পয়সা কর দিতে হবে গার্মেন্ট মালিকদের। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবেই এ কর কমানো হয়েছে।

দেশের শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করে যারা অবাধে মুনাফা করছে, যাদের জন্য নানা ধরনের কর অবকাশের সুযোগ রাখা হয়েছে, যাদের জন্য প্রায় বিনা শর্তে, বিনা সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা আছে, যারা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাদের সুবিধার জন্য আইন পর্যন্ত পাল্টানো হয় সেই শিল্পপতি-ব্যবসায়ী চক্রের জন্য কর কমানোর কথা সুপারিশ করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। আর কর বাড়াচ্ছেন কাদের? এর আরো একটি নমুনা দেখুন। এবারের বাজেটে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর আয়করের হার ৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ হাজার টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ আগামী অর্থবছর থেকে কোনো ব্যক্তির বাৎসরিক আয় আড়াই লাখ টাকার বেশি হলে (অর্থাৎ যাদের মাসিক আয় মাত্র ২১ হাজার টাকা) তাকে ৪ হাজার টাকা আয়কর দিতে হবে।

বাজেট প্রণয়নের আগে গত ৫ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'দেয়ার ইজ নো কালো টাকা ইন দিস বাজেট'। অথচ এবারও কিন্তু কালোটাকা সাদা করার পুরনো রীতি বহাল রাখা হল। শুধু তাই নয়, দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া লক্ষ কোটি টাকা ফিরিয়ে আনা, এসবের মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কোনো কথাই বাজেটে বলা হল না।

গরিব মানুষকে বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা বাজেটে নেই

এ দেশ থেকে সামান্য কাজের প্রলোভন দেখিয়ে হাজার হাজার লোককে সমুদ্রপথে পাচার করা হয়। তাদের জিম্মি করা হয়, বিদেশের জঙ্গলে বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হয়। অনেকেই লাশ হয়ে সাগরে ভেসে যায়, অথবা গণকবরে ঠাঁই পায়। নয়ত তারা বিভিন্ন দেশের কারাগারে বন্দি জীবনযাপন করে। নারীরা পাচায় হয়ে ঠাঁই পায় বিভিন্ন দেশের পতিতালয়ে। সে-দেশে মানুষের কর্মসংস্থান কত জরুরি বিষয় তা কি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু শুধু এবার নয়, বিগত বছরগুলোতে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কখনোই বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়নি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপন। কিন্তু এ লক্ষ্যেও কখনো কোনো উদ্যোগ নেয়া হনি। গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের জন্য রেশনিং, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, সমস্ত বয়স্ক ও অক্ষম নারী-পুরুষের বার্ধক্য ভাতা চালু করার দাবি সম্পূর্ণ উপক্ষো করা হয়েছে। এ বাজেটে কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামান্যতম রাষ্ট্রীয় সহায়তা নেই। সেচের ডিজেল-বিদ্যুৎ, সার-বীজের ওপর প্রত্যক্ষ ভর্তুকি নেই। উৎপন্ন ফসলের জন্য মূল্য সহায়তা নেই, সুলভ কৃষি ঋণের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। একইভাবে দেশের শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো সহায়তা, কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য কোনো পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি। পাচার হওয়া হাজার হাজার মানুষকে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যও কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।

সংগঠিত হোন, প্রতিবাদের শক্তি গড়ে তুলুন

বাজেট কি, বাজেট কেন হয় – দেশের বেশিরভাগ মানুষ, এমনকি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মানুষও এসব প্রশ্নের সামনে অসহায় বোধ করেন। এক সময় বাজেটকে কেন্দ্র করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর রেওয়াজ ছিল প্রবল। মানুষ ভাবত, বাজেট মানেই জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি। মূল্য বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া আর আগের মতো নেই। এর অর্থ এই নয় যে মূল্যবৃদ্ধি কমছে। আসলে বাজেট প্রণেতা এবং বাস্তবায়নকারীরা এখন অনেক সতর্ক, চতুর। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির কাজটা সারা বছর ধরেই চলে। এর সাথে যোগ হয়েছে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন করের নতুন হাতিয়ার। জিনিসপত্রের দাম বাড়ুক বা না বাড়ুক, খোদ ক্রেতা বা ভোক্তাকেই কর দিতে হবে সে আপনি যাই কিনুন। আসলে বাজেট হল কোনো দেশে চলমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটার সারাংশ, যা আমরা উপরে তুলে ধরেছি।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে আমরা খুব কম মানুষই সচেতন। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-সংকট এই ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত। বাংলা প্রবাদে বলে, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হয় না। ঠিক তেমনি আমরা যত উদাসীন, যত অসচেতনই থাকতে চাই না কেন, জীবনের সংকট আমাদের পিছু পিছুই আসবে। সুতরাং অন্ধভাবে অচেতনভাবে লুটেরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিগোষ্ঠীর শিকারে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে আসুন সচেতনভাবে ব্যবস্থাটিকে বুঝে নেই। জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রতিদিনকার সমস্যা সংকট নিয়ে সংগঠিত হই, প্রতিবাদের শক্তি, আন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলি।

ঈদের দশ দিন আগে প্রাইভেট গাড়ি চালকদের বেতন-বোনাসের দাবি

ঈদের দশ দিন আগে বেতন-বোনাসের দাবীতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন প্রাইভেট গাড়ী চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকাল ৩.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক মামুন মিয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্যাণ দত্ত, রাজু আহমেদ, গাড়ী চালক আ: রশিদ, মাহাবুব প্রমুখ। সমাবেশে ড্রাইভারদের ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ, ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, নিয়োগপত্র, ৮ ঘন্টা কাজ, অতিরিক্ত কাজের জন্য ওভার টাইম ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়।

মধ্য আয়ের বাংলাদেশ : আম জনতার গলায় ফাঁস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মধ্য আয়ের দেশ কথাটার মানে কি?

যদিও দেশের বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে যে বিশ্বব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি তা নয়। বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য সদস্য দেশগুলোকে নিম্ন আয়ের দেশ, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ – এই চার ভাগে ভাগ করেছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছে। এখন বিশ্বে নিম্নআয়ের দেশ আছে ৩১টি, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ ৫১টি, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ৫৩টি এবং উচ্চ আয়ের দেশ ৮০টি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। জাতিসংঘের তালিকায় বাংলাদেশ এখনো স্বল্পোন্নত দেশ। জাতিসংঘের তালিকার এরপরের ধাপ উন্নয়নশীল দেশ, শেষ ধাপ উন্নত দেশ। জাতিসংঘ তাদের হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক সূচক ব্যবহার করে থাকে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা। আর বিশ্বব্যাংকের তালিকাটি শুধু আয়ভিত্তিক। ফলে এখানে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যায় না।

বিশ্ব ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পর পর তিন বছরের বিনিময় হারভিত্তিক গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় যদি ১ হাজার ৪৫ ডলারের বেশি হয় তাহলে সেই দেশটিকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এ আয় যদি ৪ হাজার ১২৫ ডলার অতিক্রম করে তাহলে সেই দেশটিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর এই জাতীয় আয় যদি ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার পেরিয়ে যায় তাহলে সেটিকে চিহ্নিত করা হয় উচ্চ আয়ের দেশ হিসাবে।

ধাপ্পাবাজির 'মাথাপিছু আয়'

'মাথাপিছু আয়' কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁকি থেকে যায়। কথিত বিলিয়নিয়ার মুসা বিন শমসেরের নাম অনেকেই জানেন। সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে তার টাকা জব্দ হওয়ার ঘটনায় তিনি আলোচনায় এসেছেন। তো এই মুসা বিন শমসের যে কলমে সই করেন তার দাম ৭৭ কোটি ৩২ লাখ ১০ হাজার টাকা। ২৪ ক্যারেট স্বর্ণে তৈরি কলমটিতে রয়েছে ৭৫০০টি হীরকখণ্ড। হীরকখচিত যে জুতা তিনি পায়ে দেন তার প্রতি জোড়ার মূল্য ১ লাখ ডলার। তার ঘড়ির দাম মিলিয়ন ডলার। তো এই মুসার আয়ের সাথে বাংলাদেশের একজন দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষক, যার নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তার আয় যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ওই কৃষক বা শ্রমিকও কোটি পতি হিসাবে গণ্য হবেন। অথচ ওই শ্রমিক/কৃষক যে হতদরিদ্র দশায় ছিলেন সে দশাতেই থাকবেন।

আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে দেশে একজন কোটিপতি তৈরি হলে, তাঁর জন্য এক হাজার মানুষকে গরিব হয়ে যেতে হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যানের জাতীয় পর্যায়ের পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন চিত্রে দেখা যায়, ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ এবং এর ওপরের ডিসাইল এক এবং ডিসাইল দুই অর্থাৎ দরিদ্রতম ২৫ শতাংশের আয় কমে গেছে। আয় বেড়েছে ধনী ৫০ শতাংশের। এ প্রক্রিয়াতেই স্বাধীনতার পর থেকে দেশের বেশিরভাগ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে, লুণ্ঠন করে, কোটি কোটি শ্রমজীবী শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করে তৈরি হয়েছে কোটিপতি শ্রেণী। আর স্বাধীনতার পর থেকে মানুষের নিঃস্ব হওয়ার হার বাড়ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, অভাব বাড়ছে, বেকারত্ব বাড়ছে।

বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরিব মানুষের সংখ্যা

সরকারি হিসাবে, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচজন। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়াঁয় ৪৭ জন। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেখা গেছে, ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫৫৪। অর্থাৎ ব্যাংকে আমানত টাকার হিসাবে দেশে এখন কোটিপতির সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ হাজার। আর বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ এবং অবৈধ সম্পদ ও বিদেশে পাচার করা টাকার পরিমাণ ধরলে বাস্তবে এ দেশে কোটিপতির সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়ায় সম্ভাবনা। এসব হিসাব থেকে আরো দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে (২০১০-'১৪) ব্যাংকে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। এর বিপরীতে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন হিসাবে বাংলাদেশ এখনও কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ, অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এদের আয় দৈনিক ২ ডলারেরও কম অর্থাৎ ১৫০ টাকা। গত কয়েক বছরে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। সুতরাং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪৮-এ উঠে গেছে। প্রকৃত হার কিন্তু আরো বেশি, প্রায় ৫০ শতাংশ। যার অর্থ প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যা ছিল এখন সে পরিমাণ মানুষ দরিদ্র।

সীমাহীন লুটপাটের ফসল বিপুল কালোটাকা

আইনগত ও বৈধ পন্থার বাইরে যে টাকা উপার্জন করা হয়, সেটাকেই কালো টাকা বলা হয়। বাংলাদেশ এখন বিপুল কালোটাকা ও অবৈধ টাকার দেশ। এই চিত্রটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দেশের বাস্তব চিত্রটি কি। এই সংখ্যা দেখিয়ে দেয় যে এদেশে পুঁজিবাদী পন্থায় বৈধ ও আইনগত শোষণের পাশাপাশি কি ভয়াবহ লুণ্ঠন-দুর্নীতি চলছে। বাংলাদেশে কালোটাকার পরিমাণ নিয়ে বহু দিন ধরেই অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু কালো টাকা জন্ম নেয়ার পথ বন্ধ করা দূরে থাক, কালো টাকার মালিকদের শাস্তি দেয়া, কালো টাকা জব্দ করার কোনো উদ্যোগ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। অথচ অর্থনীতিবিদদের দেয়া ২০১৪ সালের এক হিসাবে গত ৪২ বছরে দেশে পুঞ্জীভূত কালো টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ থেকে ৭ লাখ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪২ দশমিক ৮০ শতাংশ। প্রতিবছর এর পরিমাণ বাড়ছে, দেশের 'আন্ডার গ্রাউন্ড' বা ছায়া অর্থনীতিতে বছরে ৭০ হাজার কোটি কালো টাকা যুক্ত হচ্ছে।

এই কালো টাকার একটি অংশ পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১২টি দেশ চিহ্নিত করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এন্টি মানি লন্ডারিং টাস্কফোর্স। এর আগে মালয়েশিয়ান সরকারের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম প্রকল্পে বিনিয়োগে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রথম অবস্থানে চীন। এগুলো সবই হয়েছে টাকা পাচারের মাধ্যমে।

দেশ থেকে টাকা পাচারের আরো একটি নমুনা হল সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশীদের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ। সারা দুনিয়া থেকে যখন সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় মোট গচ্ছিত অর্থ কমেছে, তখন বাংলাদেশ থেকে তা বেড়েই চলেছে। সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশীদের আমানত ২০০২ সালে ছিল ৩ কোটি ১০ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৪ সালে বাংলাদেশীদের জমার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৬০ লাখ সুইস ফ্র্যাংক। বাংলাদেশী টাকায় এর পরিমাণ ৪ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা (প্রতি সুইস ফ্র্যাংক ৯০ টাকা হিসাবে)। আগের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে তা ছিল ৩ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা। এ হিসাবে এক বছরে বেড়েছে ১ হাজার ৩১৮ কোটি টাকা। কোনো বাংলাদেশী তার নাগরিকত্ব গোপন করে টাকা জমা রাখলে সেসব তথ্য এই প্রতিবেদনে নেই।

ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) রিপোর্ট অনুসারে ২০০১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এক যুগে বাংলাদেশ থেকে ২ হাজার ১৩ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা, যা দিয়ে ৬টা পদ্মা সেতু বানানো সম্ভব। আলোচ্য সময়ে দেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে ৯০৩ কোটি ডলার। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৭২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ যে পরিমাণ এফডিআই দেশে এসেছে তার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়েছে।

লুটেরাদের উল্লাস আম জনতার গলায় ফাঁস

বিশ্বব্যাংক যখন বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ ঘোষণা করেছে সেই সময় প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের ৬৫ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ অনিরাপদ পানি পান করে। এই পানিতে আর্সেনিক এবং ই. কোলাই (মলের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া) সংক্রমণ আছে। শুধু সুপেয় পানির দিক থেকেই কি ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসছে! এমন অবস্থা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-কর্মসংস্থানসহ অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই।

২০১৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশে বেকারত্ব বেড়েছে ১ দশমিক ৬ শতাংশ, কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার কমেছে ২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান মতে, এই হার বজায় থাকলে ২০১৫ সালে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটিতে। পরিসংখ্যান বলছে, বেকারত্বের হার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট-এর ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার। দক্ষিণ এশিয়ায় এর চেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত বেকার আছেন কেবল আফগানিস্তানে, ৬৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারত্ব বাড়ার হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর কর্মবাজারে প্রবেশ করছে প্রায় ২৭ লাখ আর চাকরি পাচ্ছে মাত্র ১ লাখ ৮৯ হাজার। অপরদিকে যে বিশ্বব্যাংকের সার্টিফিকেট নিয়ে এত হৈচৈ, সেই বিশ্বব্যাংক মনে করে, সরকার কম দেখালেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। এর ওপর এখন প্রতিবছর নতুন করে ১৩ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে যোগ হচ্ছেন।

২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে শাসক দল আওয়ামী লীগ বলেছিল, তারা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের একটি দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বিএনপি পাল্টাপাল্টি বলেছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তারা উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ বানাবে। একতরফা নির্বাচনে গায়ের জোরে আওয়ামী মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন। আর তাদের আমলেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার ঢক্কনিনাদ দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যে পুঁজিবাদী শোষণ-লুটপাটের প্রক্রিয়ায় দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সম্পদ বাড়ছে, যা দেখিয়ে এদেশকে একটি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে চালানো হচ্ছে তার আসল চেহারা কত বর্বর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, লুটেরাদের এই উল্লাসের আড়লে আছে ফ্যাসিবাদী শাসনের আড়ালে গলায় ফাঁস পরানো লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ।

সিলেটে স্মৃতিসৌধের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দাবিতে শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখা ঘোষিত আগামী ২৮ জুলাই জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সিলেটের পাড়ায়-পাড়ায়, অফিস-আদালতে, দোকানপাটে দাবির পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

২৯ জুন থেকে এ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়। প্রচণ্ড তাপদাহ কিংবা বৃষ্টির মধ্যে শিশু কিশোর মেলার সদস্যরা সাধারণ মানুষকে স্বাক্ষর দিতে আহবান করলে মানুষ স্বাক্ষর দিয়ে দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এসময় মেলার সংগঠকদের আহবানে সবাই আন্দোলনের তহবিলে অর্থ দিয়েও সহযোগিতা করেন। স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলার সংগঠক রুবাইয়াৎ আহমেদের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন লিপন আহমেদ, সাদিয়া নোশিন তাসনিম, পলাশ কান্ত দাশ, তৌহিদুজ্জামান জুয়েল, নিশাত কর সানি, পিংকি চন্দ, ইয়াছিন আলী ইমন, দীপ্ত, রুদ্র, অপূর্ব প্রমুখ।

সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাংক ঘেরাও

১২ জুলাই বেলা ১২টায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারসহ সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষক ক্ষেতমজুরদের জন্য ব্যাংক ঋণ চালুর দাবিতে দারিয়াপুর রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ঘেরাও করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ(মার্কসবাদী) আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা খোকন, জাহেদুল হক, মোজাহেদুল ইসলাম রানু, মাহবুবুর রহমান খোকা প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, গত কয়েক বছর যাবত কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। দু'বেলা ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা যখন কঠিন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় ব্যাংক থেকে টাকা আদায়ের জন্য দায়ের করা হচ্ছে সার্টিফিকেট মামলা। বড় বড় ঋণ খেলাপি ব্যাংক লুটেরাদের টাকা উদ্ধার করতে না পেরে সরকার বাজেটে ব্যাংকের ঘাটতি পূরণের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিচ্ছে। লুটেরা ঋণ খেলাপিদের যে কোনো একজনের টাকা উদ্ধার করলে সারাদেশের চাষীদের ঋণ মওকুফ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তা হবে না, কারণ সরকার ঐ লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাকারী। সহজশর্তে স্বল্পসুদে কৃষক ক্ষেতমজুরদের জন্য ব্যাংক ঋণ চালুর দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে মহাজনী সুদী কারবার ও এনজিও সুদী কারবারীদের ঋণ জালে আটকা পরছে কৃষক-ক্ষেতমুজরা।

খাগড়াছড়িতে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের দাবি বিদ্যুৎমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি

খাগড়াছড়িতে চলমান প্রবল বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের দাবিতে আন্দোলনরত 'বিদ্যুৎ সংকটে ভুক্তভোগী জনতা'র ব্যানারে গত ১ জুলাই জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এর আগে গত ১৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত তিন হাজারের বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ, পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলন কমিটি গঠন ও প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বিভিন্ন পাড়া থেকে আন্দোলন কমিটির নেতৃত্বে মিছিলসহ মানুষ খাগড়াছড়ি মুক্তমঞ্চে সমবেত হতে থাকে। এখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু দাউদ এবং পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খাগড়াছড়ি জেলার সভাপতি নাজির হোসেন। বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মংসাথোয়াই চৌধুরী, বাসদ (মার্কসবাদী)-র জেলা আহ্বায়ক জাহেদ আহমেদ টুটুল, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কৃষ্টি চাকমা, অরণ্য তারণ্যের সভাপতি সাইফুদ্দিন মিঠু, ক্যাব জেলা সভাপতি আবু তাহের মুহাম্মদ, সাংবাদিক অপু দত্ত, স্বর্ণ ব্যবসায়ী লিটন, শিশু কিশোর মেলার সংগঠক সনাথ চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি বেসরকারি সব মহল থেকেই স্বীকার করা হচ্ছে যে খাগড়াছড়িতে বিদ্যুৎসংকট একটা প্রধান সমস্যা। বছরের পর বছর জেলাবাসী এ সংকট সহ্য করে চলেছে। সম্প্রতি এ সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩/৪ ঘণ্টাও বিদ্যুৎ থাকে না। দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে লো-ভোল্টেজ, অযৌক্তিক বিদ্যুৎবিল, বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে নানা তালবাহানা ও দুর্নীতি ইত্যাদি। সমাবেশ থেকে বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের দোহাই না দিয়ে অবিলম্বে বিকল্প বৈদ্যুতিক লাইন টেনে এ সংকটের আশু সমাধান জানান। অন্যথায় জেলাবাসী আরো বড় ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। সমাবেশ শেষে একটি দীর্ঘ মিছিলসহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

অবিলম্বে সরকারিভাবে ধান ক্রয় অভিযান শুরু করার দাবি

৩১ মে বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ধানসহ কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কৃষকদের রক্ষায় সরকারীভাবে ধান ক্রয় অভিযান অবিলম্বে শুরুর দাবি জানায় বাসদ(মার্কসবাদী)। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন ও জহিরুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুর, দিনাজপুর. গাইবান্ধা, বগুড়া, নীলফামারী, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় কৃষকরা রাস্তায় ধান ফেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

গ্রিসের না ভোট

নয়া উদারনৈতিক বিকল্পের ব্যর্থতাকে প্রকট করল

৫ জুলাই গণভোটে গ্রিসের জনগণের রায় ঐতিহাসিক। আরও ঋণ পেতে হলে গ্রিস-কে যেসব শর্ত মানতে হবে বলে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কর্তা জার্মানি-ফ্রান্স হুকুম দিয়েছিল, গ্রিসের জনগণ বিপুলভাবে জানিয়ে দিল– না, এই সব শর্ত আমরা মানব না। সন্দেহ নেই, শুধু ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কর্তাদের ক্ষেত্রেই নয়, তাবড় সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রেও, বিশেষত নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদী মডেলের প্রবক্তাদের কাছে এ এক বিরাট ধাক্কা, যাকে পরাজয়ও বলা যায়। পটভূমি দেখে নেওয়া দরকার। ২০১০ সাল থেকেই প্রবল ঋণ সংকটে ভুগছে ইউরো জোনের বিভিন্ন দেশ। এই ঋণ সংকটের মধ্যমণি এখন গ্রিস। ইউরো জোনের মধ্যে এই দেশের ঋণের পরিমাণ ও বাজেট ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। গত কয়েকবছর ধরে আই এম এফ, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং গ্রিসের সরকার এই ঋণের কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই সব পরিকল্পনা যত কার্যকর হয়েছে, দেখা গেছে গ্রিস সরকার তত আরও বেশি বেশি করে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে এবং বর্তমানে অবস্থা এমন জায়গায় দাড়াঁয়, ৩০ জুনের মধ্যে আই এম এফের পাওনা ১৬০ কোটি ইউরো পরিশোধ করতে না পারলে গ্রিস দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

কিন্তু গ্রিসের সরকারের ভাঁড়ারে কানাকড়িও নেই। তা হলে উপায় কী? সামনে উপায় দুটো। প্রথমটা হল, গ্রিসের জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের উপর বাড়তি করের বোঝা না চাপানো, কৃচ্ছ্রসাধনের মোড়কে মজুরি, পেনশন সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাঁটাই না করা, দুই–সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ধারকবাহক আই এম এফ, ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভয়ঙ্কর শর্ত মাথা পেতে মেনে নিয়ে গ্রিসের জনগণের উপর শোষণ-অত্যাচারের স্টিম রোলার চাপানো।

সংকট ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথেই গ্রিসের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ তুলে নেওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। একদিনেই আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছে ১৫০ কোটি ইউরো। সব মিলিয়ে এক সপ্তাহেই তুলে নিয়েছে ৫০০ কোটি ইউরো। সংকটের কালো ছায়া আজ গ্রিসের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকেই গ্রাস করতে চলেছে।

ঋণ সংকটে পড়া এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আবার বড় মাপের ঋণ করা বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া অনুন্নত *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচিতে পুলিশি বাধা

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৫ জুন বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের পূর্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আকমল হোসেন, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আফরোজা বুলবুল, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্নেহার্দ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মণিদীপা ভট্টাচার্য।

বক্তারা বলেন, 'একটি অগণতান্ত্রিক পরিবেশে দিনের পর দিন অন্যায় ঘটনাগুলো যেভাবে বিনা বিচারে ঘটে চলছে, নারী নির্যাতনকারীরাও সরকার ও প্রশাসনের সেই অন্যায় প্রক্রিয়ার কারণে পার পেয়ে যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে নারীদের প্রতিনিয়ত অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ছেলে-মেয়েরাও তাদের শিক্ষার পাশাপাশি কোনো বিনোদনের সুযোগ না পেয়ে পর্নোগ্রাফি-মাদকে বিনোদনের পথ খুঁজছে। এই ধরনের সামাজিক আয়োজন প্রতিদিন নারী নির্যাতকের জন্ম দিচ্ছে।'

সমাবেশ শেষে স্মারকলিপি পেশের জন্য মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণের পর শাহবাগে পুলিশি বাধার মুখে সেখানেই সমাবেশ শেষ করে। এরপর ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দিতে যান।

বাহাদুর শাহ পার্কের সমাবেশে মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সীমা দত্ত, রাজীব চক্রবর্তী, শরীফুল চৌধুরী, মেহরাব আজাদ, কৃষ্ণ বর্মণ, এলাকাবাসী রহিম ফরায়েজী।

মিরপুর গোল চক্করে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সাইফুল হাসান মুনাকাত। বক্তব্য রাখেন নাহিদ ইসলাম, বিদ্যাসাগর পাঠাগারের উপদেষ্টা শিক্ষক মনিরুজ্জামান, ডা. মুজিবুল হক আরজু, কল্যাণ দত্ত।

মোহাম্মদপুরের টাউনহলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মর্জিনা খাতুন, বক্তব্য রাখেন স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, রাশেদ শাহরিয়ার, গোলাম রাব্বি।

লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থে দেশ পরিচালনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবহন, কর্মসংস্থানসহ জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবহন, কর্মসংস্থানসহ জনগণের বেঁচে থাকার অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে গণ-সমাবেশ ও পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ৮ জুলাই সকাল ১০.৩০টায় ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে পদযাত্রা রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। গণ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। এতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, উজ্জ্বল রায়, ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক এবং কৃষক ফ্রন্ট নেতা আহসানুল হাবিব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু।

সভাপতির বক্তব্যে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, দেশের মানুষের দুর্দশার প্রধান কারণ এ রাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এখানে ধনিকশ্রেণীর সরকার ক্ষমতাসীন। জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে এদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক পুঁজিপতিদের জন্ম হয়েছে। এই মুষ্টিমেয় লুটেরা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এই লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থেই ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের প্রহসন চালিয়ে আওয়ামী মহাজোট সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক কায়দায় শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। আর এদের মদত দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ভারতের শাসকগোষ্ঠী।

তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের সময় 'কানেকটিভিটি', ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ, সমুদ্র সীমায় অবাধে চলাচলের সুযোগ, ভারতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ করিডোর, দায়মুক্তি আইন করে বিদ্যুৎ খাতে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি আদানি-আম্বানীদের সাথে বিনিয়োগের চুক্তি – এ চুক্তিগুলির সবই হয়েছে ভারতের একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের স্বার্থে। অথচ তিস্তার পানির ওপর বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি প্রত্যাহারের ভারতীয় অন্যায় পরিকল্পনা নিয়ে কোনো আলোচনা হল না। সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্প বন্ধের কোনো কথা শোনা গেল না। ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর যে সামরিক খবরদারি চালাচ্ছে তা বিবেচনায় নিলে 'কানেকটিভিটি' শেষপর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি বিরাট বিপদ হিসাবে দেখা দিতে পারে। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী আওয়ামী মহাজোটের ফ্যাসিবাদী শাসন এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের সকল বাম-গণতান্ত্রিক *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

'মোদির বাংলাদেশ সফর : ২২ দফা চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ' শীর্ষক মতবিনিময়

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক হতে হবে সমমর্যাদা, ন্যায্যতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে গত ২ জুন সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর : ২২ দফা চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু। সভা পরিচালনা করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন বাসদ(মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আকমল হোসেন, প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, প্রকৌশলী বি ডি রহমতউলাহ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়কারী এড. আব্দুস সালাম, হামিদুল হক, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন।

সভার শুরুতে বাম মোর্চার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনির্বাচিত ও অগ্রহণযোগ্য সরকারের প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনের বিনিময়ে মোদির ঢাকা সফরে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ অমীমাংসিত রেখে ভারতের সকল চাহিদাকেই একে একে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। মোদির এই সফরকে অনির্বাচিত সরকার অনির্দিষ্টকাল তাদের ক্ষমতায় থাকার অনুমোদন হিসাবেই বিবেচনা করছে। ধূর্ত ও অভিজ্ঞ মোদিও তাদের চাহিদা মিটিয়েছেন। তিনি তার এক হালি বক্তৃতার কোথাও সচেতনভাবেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ বা এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। আমাদের অধিকাংশ গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজও সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে মোদির সফর-বক্তৃতা-চুক্তি-সমঝোতায় তাদের উচ্ছাস আর আনন্দ প্রকাশ করছেন। অথচ মোদির এই সফরে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির প্রবাহে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সমাধান না করে ভারতের চাহিদামত তাদেরকে একতরফা ট্রানজিট-করিডর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে, অবকাঠামোর ব্যয়ভার কিভাবে নির্ধারিত হবে, নিরাপত্তা অবকাঠামো কিভাবে-কার দায়িত্বে থাকবে, এর পরিবেশগত দায়ভার, ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট চোরাচালান ও মাদক পাচার সমস্যার কিভাবে সুরাহা হবে এসব প্রশ্নের যথাযথ সমাধান ছাড়া 'কানেকটিভিটি'র নামে ভারতকে একতরফা ট্রানজিট ও বন্দর সুবিধা প্রদান হবে আত্মঘাতি এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অজুহাতে কথিত বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের ভারতে অনুপ্রবেশের যুক্তিতে বাংলাদেশের প্রায় পুরো স্থল সীমান্ত জুড়ে ভারত যে কাঁটাতারের প্রাচীর নির্মাণ করেছে, সেই যুক্তিতে বস্তুত সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ভারতের এই বিশা-লব্যাপ্ত ট্রানজিট সুবিধার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চয় একটি গুরুতর প্রশ্ন।

প্রচলিত সকল বিধিবিধান লংঘন করে বিনা টেন্ডারে জ্বালানি সংক্রান্ত বিশেষ *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org